সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ০৩-০৪
২১ অক্টোবর-২০২৪
সোমবার

ঐতিহ্যবাহী হাদুম মসজিদ, কসোভো

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ০৩-০৪
* বার : সোমবার

◈ ২১ অক্টোবর-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৫ কার্তিক-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ১৭ রবিউস সানি-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - ❖ **ধৈর্য: মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য!**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - ❖ **আত্মসমালোচনা: গুরুত্ব ও পদ্ধতি**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ:**
  - ❖ **আল কুরআনে দুধ উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ**
    ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ১৩
  - ❖ **বিপদে পতিত হলে পাঠ করুন “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন”**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৪
  - ❖ **আল্লাহর ভালোবাসা লাভের সরল পথ**
    মিজানুর রহমান বিন আব্দুল ওয়াজেদ- ১৭
- **পরিবেশ-প্রকৃতি:**
  - ❖ **দূষণচক্রে জেরবার: উৎকণ্ঠায় নগরবাসী**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২০
- **সাহাবা চরিত:**
  - ❖ **একজন মহিয়ষী নারী উম্মুল হাকীম বিনতুল হারেস**
    আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী- ২২
- **ক্বাসাসুল কুরআন:**
  - ❖ **নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২৫
- **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৭
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা:**
  - ❖ **অন্যায়কে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে**
    মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম- ২৮
- **নিভৃত ভাবনা:**
  - ❖ **শিক্ষার্থীর আশার আলো শিক্ষক**
    মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)- ৩০
- **মহিলা জগৎ:**
  - ❖ **নারীদের ‘ইল্‌মী নববী চর্চা**
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ৩১
- **আলোর পরশ** ৩৪
- **কবিতা** ৩৮
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৮

সম্পাদকীয়

ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি?

ঐক্য ও ইত্তিফাক মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। এই ঐক্যবদ্ধতা হতে পারে জাতিসত্তা, স্বভাব প্রকৃতি, চিন্তা-চেতনা এবং সভ্যতা সংস্কৃতির ঐক্য। ইখতিলাফ বা মতানৈক্য হলো ঐতিহ্যগত দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে কারণ আল্লাহ তা'আলা যখনই অতীত উম্মতের মাঝে মতানৈক্যের মহড়া দেখেছেন, তখনই তাদেরকে ঐক্য ও সংহতির মধুময় মিলনে জমায়েত করার জন্য আসমানী হিদায়াত দিয়ে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মহা মহিয়ান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবীদের পাঠালেন সু-সংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি, কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই মতভেদ করেছে যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের হিদায়াত দান করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল-সুদৃঢ় পথ দেখান।"

মূলত এই আয়াতে একতা বলতে 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শের একতাই উদ্দেশ্য। সে কারণে আল্লাহ তা'আলা বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে ওয়াহীভিত্তিক পুনঃ একতাবদ্ধ করার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়– এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তা ছিল তাওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার দরুণ মতানৈক্য শুরু হয়। দীর্ঘ দিন পর 'আমল বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য ও মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ শুরু হয়। এভাবে যখনই মানুষ সৎ পথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো না কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়।

একটু বিচক্ষণতার সাথে বিচার করলে আমাদের ক্ষুদ্র বিবেকে ধরা পড়বে যে, ঐতিহ্যগত ঐক্য হতে দলে দলে ও বিভিন্ন মতে বিভক্ত হওয়ার প্রধান কারণ পারস্পরিক জেদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি নবুওয়াতী বিধান হতে বেরিয়ে পড়ল, সে শির্ক এর ন্যায় অনুরূপ পাপে পতিত হলো। মূলত আদম সন্তানদের মাঝে শির্ক ছিল না; বরং আদম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর এ সমস্ত সন্তানেরা যারা তাঁর দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তারা নবুওয়াতের অনুসরণের কারণে তাওহীদের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে।"

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

আদম ও নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে ব্যবধান ছিল দশ শতাব্দীর। তারা সকলেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর নবীদের শরীয়ত অনুসরণ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তারা শির্ক-এ পতিত হলো।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, ঐক্যই মানুষের ঐতিহ্য, স্বভাব জাত ধর্ম। আর বিভক্তি পরবর্তীতে সৃষ্ট ঘৃণ্য কর্মধারার নাম। যা আল্লাহ তা'আলা কখনোই পছন্দ করেননি। সে কারণে তিনি নবী ও রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে ঐক্য ও জমায়েত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আফসোস! মহান আল্লাহর অমোঘ বিধান ছেড়ে দিয়ে আজ মুসলিমরা শত দলে বিভক্ত। শুধু তাই নয়, দল ও উপদলের এই ঘৃণ্য ধারা অব্যাহত রেখেছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন এর পরিণতি গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? ☒

আল কুরআনুল হাকীম

ধৈর্য: মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দার্থ

يَا শব্দটি حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বানসূচক অব্যয়। اَلَّذِيْنَ এটি اسم موصول অর্থ- যারা। শব্দটি দু'দিক (الاسماء موصولة – مندى) معرفة হওয়ার কারণে এবং ال যুক্ত হওয়ায় فاصلة হিসেবে (اَيُّهَا) যুক্ত হয়েছে। আর اٰمَنُوْا অর্থ- তারা ঈমান এনেছে। اَسْتَعِيْنُوْا শব্দটি جمع مذكر আমরে হাযের। অর্থ- তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। بِالصَّبْرِ এখানে بِ অক্ষরটি حرف جار এ অক্ষরটি শব্দের শুরুতে এসে শেষ বর্ণে যের প্রদান করে। অক্ষরটি ১০টি কিংবা ১৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এটি استعانت তথা সাহায্যে, উপায়ে, দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি অর্থে এসেছে। অর্থ- ধৈর্যের সাহায্যে وَ এটি حرف عطف অর্থ- এবং। الصَّلٰوةِ এটি হরফে আতফ وَ দ্বারা الصَّبْرِ এর উপর আতফ হয়েছে। তাই এর অর্থ হবে- নামাযের সাহায্যে। اِنَّ اللّٰهَ অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ। مَعَ অর্থ- তিনি সাথে রয়েছেন। الصّٰبِرِيْنَ অর্থ- ধৈর্যশীলদের।

সরল বঙ্গানুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১]

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতে কারীমাটি মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমের সর্ববৃহত্তম সূরা, সূরা আল বাক্বারাহ্ হতে চয়ন করা হয়েছে। এটি সূরা আল বাক্বারাহ্'র ১৫৩ নং আয়াত।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যখন ব্যাপক সমালোচনা চলছিল, তখন মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। **প্রথমত-** তারা মুসলিমদের মাঝে নানা রকম জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামের সত্যতার উপর আঘাত এবং মুসলমানদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছিল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব কূট-প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত-** তাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ জওয়াব দেওয়ার পরও যেহেতু আরো নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তর্কের পর তর্কের অবতারণা করে মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছিল, সেহেতু এ আয়াতে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আত্মিক শক্তি অর্জন করে সে সব আঘাতের মোকাবেলা করার উপদেশ দিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"

আয়াতটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। এর একটি হলো– সবর বা ধৈর্য আর অন্যটি হলো– সলাত বা নামায। বর্ণনা-রীতির মধ্যে اَسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৩।*

ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায়, তা এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য ও নামায। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

ধৈর্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ الصَّبْر-এর অর্থ হচ্ছে– সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। ইমাম কুরতুবী বলেন– الصَّبْر শব্দকে অন্য কোনো শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারী অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। **এক-** নফসকে সকল প্রকার হারাম ও না-জায়িয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, দুই- নফসকে 'ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং **তিন-** যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ- যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা 'সবর'-এর পরিপন্থী হবে না।[২] প্রথম দু'টি শাখা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণায় তৃতীয় শাখাকেই 'সবর' হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ প্রথম দু'টি শাখা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্য ধারণকারী সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে থাকেন। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশ্রের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্য ধারণকারীরা কোথায়?" এ কথা শুনার সাথে সাথে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ইবনু কাসীর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আরা বলেন–

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থাৎ- "সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে।"[৩]

এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

ধৈর্য মানব হৃদয়ে সাহস যোগায়ঃ বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে তারা হতাশাগ্রস্ত হয় না। তাদের হৃদয় থাকে পরিতৃপ্ত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾

অর্থাৎ- "আর আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য অন্য কারও জন্য নয়; তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।"[৪]

ধৈর্য ধারণ করলে মনে একপ্রকারের সাহস পাওয়া যায়। তাই লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে ধৈর্যের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

অর্থাৎ- "আর তোমার উপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।"[৫]

সলাত বা নামাযঃ সকল সমস্যা ও সংকট দূর করতে এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কুরআনে উল্লেখিত দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে– সলাত বা নামায। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার 'ইবাদতেই সবর তথা ধৈর্য নিহিত রয়েছে। এরপরও নামাযকে এ আয়াতে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– নামায এমনই একটি 'ইবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটি বিশেষ 'তাসীর' বা

[২] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

[৩] *সূরা আয্ যুমার: ১০।*
[৪] *সূরা আন্ নাহ্ল: ১২৭।*
[৫] *সূরা লুক্বমা-ন: ১৭।*

প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কেননা নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা, এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের 'নফস'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে। আর এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যে কোনো প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ﴾

আয়াতটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা তাঁর শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পরে না। বান্দা যখন মহান আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারও আর থাকে না। বলা বাহুল্য, মনের নেক মাকসুদ হাসিল করা এবং সকল সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র মহান আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- জীবনে ধৈর্য ও সলাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

দুই- মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো– ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে প্রার্থনা।

তিন- সকল সংকট উত্তরণের সহজ সমাধান ধৈর্য ও সলাত।

চার- ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমেই বান্দার মাঝে মহান আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে।

পাঁচ- ধৈর্য ও সলাত বান্দাকে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে ধন্য করে। ☒

আল কুরআনে দুধ উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ

[১৩ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

রূপান্তরিত এই রাসায়নিক বস্তুটির এই যাত্রা দু'ভাবে কার্যকর হয়: এক. 'লিমফেটিক ভেসেল' বা 'রসবাহী নালী' দ্বারা এবং **দুই.** পরোক্ষভাবে 'পোর্টাল সার্কুলেশন' বা 'মুখবাহী নালী' দ্বারা। এভাবেই সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি লিভারে এসে আবার পরিবর্তিত হয়।

"মামারী গ্ল্যান্ড" পরিপুষ্টি পায় খাদ্যের সেই সারবস্তু থেকে যে সারবস্তু উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও রূপান্তরের মাধ্যমে রক্তধারার সহায়তায় "মামারী গ্ল্যান্ডে" পৌঁছায়। সুতরাং যা কিছুই খাদ্যবস্তু থেকে পাওয়া যায়, রক্ত এবং একমাত্র রক্তই সেসব কিছুর সংগ্রাহক এবং নিয়ামক হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

এভাবে এই রক্তই দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মতো- "মামারী গ্ল্যান্ডের"ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সাধন করে। আর এই প্রক্রিয়ায় রক্ত ও অন্ত্রের রাসায়নিক বস্তু সম্মিলিতভাবে "মামারী গ্ল্যান্ডে" তৈরি করে থাকে দুগ্ধ উৎপাদনের উপাদান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক যে প্রক্রিয়াটি দেহযন্ত্রের সবকিছুকে সক্রিয় করে রাখে, সেই প্রক্রিয়ার আর একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে অন্ত্রের যাবতীয় বস্তুকে বিভিন্ন রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে একটি সারবস্তুতে পরিণত করা এবং সেই সারবস্তুকে অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা-যা সহজেই রক্তধারার সাথে মিশে যেতে পারে।

দেহের পরিপুষ্টি সাধনের ব্যাপারে এসব তথ্য, আধুনিক রসায়নশাস্ত্র এবং শারীরবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। রক্তের দ্বারা সারবস্তু সরবরাহের এই প্রক্রিয়াটি উদ্‌ঘাটন করেছেন বিজ্ঞানী হারভে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার হাজার বছর পর।

অথচ আল কুরআন সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর আগে দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে সূরা আন্ নাহ্ল-এর ৬৬ নং আয়াতে স্পষ্ট তো উল্লেখ করা হয়েছে।

দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া দুধের পুষ্টি দুধের উপকারিতা ইত্যাদি বর্ণনা আল কুরআনে যেভাবে এসেছে সত্যি এটি একটি বিস্ময়কর বিষয়। আমরা কুরআন না বুঝার কারণে শুধু তিলাওয়াত করি পুণ্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধনে আল কুরআনের যে ভূমিকা এটি আজ গবেষণার বিষয়বস্তু হওয়া প্রয়োজন। ☒

হাদীসে রাসূল ﷺ

আত্মসমালোচনা: গুরুত্ব ও পদ্ধতি

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِيْ جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَخٍ بَخٍ وَاللهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.

সরল বাংলায় অনুবাদ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি একবার ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তিনি একটি বাগানে ঢুকলেন। এমতাবস্থায় আমার ও তাঁর মধ্যে বাগানের একটি দেয়াল আড়াল হয়েছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন, ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব! আমীরুল মু’মিনীন সাবাস! সাবাস! আল্লাহর শপথ! হে ইবনুল খাত্ত্বাব! অবশ্যই তোমাকে মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে হবে। অন্যথা তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন।’[৬]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

নাম- আনাস, পিতা- মালিক, দাদা- নাযার, মাতা- উম্মু সুলাইম/উম্মু হারাম বিনতু মিলহান। তিনি ৬১২ মতান্তরে ৬১৪ ঈসায়ী সনে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন মদীনার খাজরাজ গোত্রের আনসার সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি একাধারে ১০ বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে ছিলেন। তিনি (ﷺ) তাঁর জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে ৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন– হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদায় হজ্জ ও বাইয়াতে রিজওয়ানে রাসূল (ﷺ)-এর সাথী ছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐকমত্যে ১৮০টি এবং সহীহুল বুখারী এককভাবে ৮০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৯০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বক্‌র ও ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সময়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১০৩ বছস বয়সে, ৯১ হিজরিতে বসরায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে আমিরুল মু’মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই নিজের প্রতি উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং নিজে আত্ম সমালোচনা করছিলেন যে,

وَاللهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.

অবশ্যই তোমাকে মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে হবে। অন্যথা তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন।

আলোচ্য হাদীসটি আত্ম সমালোচনার পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা হাদীসটিকে সামনে রেখে আত্ম সমালোচনা তথা মোহাসাবা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা করবো ইন্‌শা-আল্লাহ।

সুন্দর জীবন গঠনে আত্মসমালোচনার বিকল্প নেই। আত্মসমালোচনা সফল জীবনের পাথেয়। আত্মসমালোচনা না করে একে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে উন্নয়নের পথে বাধা ও পরকালীন মুক্তির অন্তরায়। হাদীসে আত্মসমালোচনাকারীকে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলা হয়েছে।

আত্মসমালোচনার পরিচয়: আভিধানিক অর্থে আত্মসমালোচনা হলো নিজের সম্পর্কে সমালোচনা করা। আর আরবীতে বলা হয়- محاسبة النفس অর্থাৎ- স্বীয় আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। বিখ্যাত আরবী অভিধান ‘লিসানুল আরব’-এ বলা হয়েছে–

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৬] *মুওয়াত্ত্বা মালেক- হা. ৩৬৩৮।*

كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ- আখিরাতের জন্য) সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক।"[৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আত্মসমালোচনাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "তোমাদের অবশ্যই চিন্তা করা কর্তব্য যে, আগামী দিনের জন্য তুমি যা প্রেরণ করেছ তা তোমার জান্নাতের পথ সুগম করছে, না-কি তোমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?"[৯]

আত্মসমালোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا، أَنْ تُحَاسَبُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.

'তোমরা নিজেদের 'আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ করো, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের 'আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামীদিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের

[৮] *সূরা আল হাশ্‌র: ১৮।*

[৯] *মাদারিজুস সালেকীন- ইবনুল ক্বাইয়িম, (বৈরূত: দারুল কিতাব আল- আরাবিইয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬), ১/১৮৭ পৃ.।*

وهو مأخوذ من مادة (ح س ب) التي تدل على العد، تقول: حسبت الشي ء أحسبه حسبا وحسبانا، وحسابا وحسابة إذا عددته.

অর্থাৎ- মুহাসাবার শাব্দিক অর্থ হলো– গণনা করা বা হিসাব করা। সুতরাং মুহাসাবাতুন নাফসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। ইংরেজীতে একে বলা হয়, self-criticism বা self-accountability অর্থাৎ- আত্মসমালোচনা।

পারিভাষিক অর্থে আত্মসমালোচনা বলতে বুঝায়, কোনো কাজ করা বা ছাড়ার পূর্বে এমনভাবে সচেতন থাকা, যেন আমি কী করতে যাচ্ছি বা কী ছাড়তে যাচ্ছি তা আমার কাছে স্পষ্ট থাকে। যদি তা দেখা যায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক, তবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করা। আর যদি তা হয় মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক তবে তা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। সাথে সাথে নিজেকে সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ তথা ফর্‌য ও নফল 'ইবাদতে আবদ্ধ রাখা। ইমাম মাওয়ার্দী বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হলো প্রতিরাতে শয়নের পূর্বে দিনের বেলা যে সমস্ত কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে সেসব কাজ তদন্ত করা। অতঃপর যে কাজটি উত্তম ও কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়, তা আগামীতে অব্যাহত রাখা এবং অনুরূপ কাজে নিজেকে জড়িত রাখা। আর যে সব কাজ নিজের ও সমাজের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়, সে কাজটি পরিত্যাগ করা এবং সাধ্যমত তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর আগামীতেও অনুরূপ কাজে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা।[৭]

আত্মসমালোচনার হুকুম ও গুরুত্ব: 'মুহাসাবাতুন নাফস' বা আত্মসমালোচনাকে প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আরা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. وَلَا تَكُوْنُوْا

[৭] *আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া- পৃ. ৩৪৬।*

'আমলসহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।'[১০]

অনুরূপভাবে হাসান বসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة.

অর্থাৎ- মু'মিন ব্যক্তিকে স্বীয় আত্মার পরিচালক হিসাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে। যারা দুনিয়াতে আত্মসমালোচনা করবে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের হিসাব হালকা হবে। আর যারা এ থেকে বিরত থাকবে, কিয়ামতের দিন তাদের হিসাব কঠিন হবে।[১১]

মাইমুন ইবনু মিহরান বলেন,

لا يكون العبد تقيًا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه.

'কোনো বান্দা প্রকৃত মুত্তাক্বী হতে পারে না, যতক্ষণ না অন্তরের হিসাব করে, এমনকি অংশীদারের চেয়েও বেশি শক্ত করে হিসাব করে।'[১২]

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি: আত্মসমালোচনা দু'ভাবে করা যায়। যথা-

১. কোনো 'আমল শুরু করার পূর্বে মুহাসাবা করা: অর্থাৎ- কোনো কাজের সংকল্প করার পূর্বেই সে কাজটি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যে, কাজটি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের জন্য উত্তম, না ক্ষতিকর? কাজটি কি হারাম, না হালাল? কাজটিতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, না অসন্তুষ্টি? অতঃপর যখন কাজটি উত্তম হবে, তখন মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজে নেমে পড়তে হবে। আর কাজটি খারাপ হলে একইভাবে পূর্ণ একনিষ্ঠতা ও তাওয়াক্কুলের সাথে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিদিন সকালে আন্তরিকভাবে প্রত্যয় দীপ্ত হতে হবে যেন সারাদিন সৎ 'আমলের সাথে সংযুক্ত থেকে অসৎ 'আমল থেকে বিরত থাকা যায়।

২. 'আমল শেষ করার পর মুহাসাবা করা: এটা তিনভাবে করা যায়–

(ক) মহান আল্লাহর আদেশসমূহ আদায়ের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করা: আমাদের উপর নির্দেশিত ফর্‌য, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলগুলো পর্যালোচনা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমি কি আমার উপর আরোপিত ফর্‌যগুলো আদায় করেছি? আদায় করলে সাথে সাথে নফল বা মুস্তাহাবগুলো কতটুকু আদায় করেছি? কারণ ফর্‌যের কোনো অপূর্ণতা হলে নফলগুলো সেটা পূরণ করে দেয়। সাথে সাথে খেয়াল করতে হবে যে, উক্ত 'ইবাদতসমূহে মহান আল্লাহর হক্ব পরিপূর্ণ আদায় করা হয়েছে কি-না? উল্লেখ্য যে, 'ইবাদতে মহান আল্লাহর হক্ব ছয়টি- **ক.** 'আমলের মধ্যে খুলূসিয়াত থাকা, **খ.** তার মাঝে নসীহত থাকা (মহান আল্লাহর একত্বের প্রতি সঠিক বিশ্বাস পোষণ করা), **গ.** রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্য থাকা, **ঘ.** একাগ্রতা থাকা, **ঙ.** নিজের উপর মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পূর্ণ উপলব্ধি থাকা, **চ.** অতঃপর এ সকল বিষয়াদির প্রতিটিতে নিজের ত্রুটি হচ্ছে– এই অনুতপ্তভাব থাকা।[১৩]

এ সকল হক্ব পূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে কি-না 'আমল সম্পন্ন করার পর তা চিন্তা করতে হবে।

(খ) অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করা: দ্বীনী দৃষ্টিকোণে যে হালাল কাজ করার চেয়ে না করাই বেশি উত্তম মনে হয়, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কোনো নির্দোষ কিন্তু গুরুত্বহীন কাজ করে থাকলে তা থেকেও নিজেকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ- আগামীতে কেন এটা করব? এর দ্বারা কি আমি মহান আল্লাহর পথে আরো অগ্রসর হতে পারব? এর দ্বারা কি দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে আমার বা মানবসমাজের কোনো লাভ হবে? তা অন্য কোনো লাভজনক কাজ থেকে আমাকে বিরত করছে কি? ইত্যাদি প্রশ্নের

[১০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৫৯।*
[১১] *ইগাসাতুল লাহফান- (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি) ১/৭৯।*
[১২] *ইগাসাতুল লাহফান- ১/৭৯।*
[১৩] *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন- ৪/৩৯৪।*

সন্তোষজনক উত্তর না পেলে সে পথে আর অগ্রসর না হওয়া।[১৪]

(গ) ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সৎ 'আমল করা: পূর্ণ সতর্কতার পরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন পাপ হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাওবাহ্ করা। সাথে সাথে সৎ 'আমল দ্বারা এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়, আর এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ।"[১৫]

রাসূল (ﷺ) বলেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا.

তুমি যেখানেই থাক মহান আল্লাহকে ভয় করো। কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎ 'আমল করো যাতে তা মিটে যায়।[১৬]

আপনি কেন আত্মসমালোচনা করবেন?

১. দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত অর্জন করার জন্য: দ্বীনের প্রতি ইস্তিক্বামাত অর্জন করা তথা অটল থাকার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম আত্মসমালোচনা, যা মানুষকে মহান আল্লাহর দরবারে মুহসিন ও মুখলিছ বান্দাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ইমাম গাযালী বলেন, 'মুহাসাবাকারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো একজন ব্যবসায়ীর মতো, যে পরকালীন জীবনের জন্য ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় দুনিয়াবী মুনাফা হিসাবে সে পেতে পারে আত্মিক পরিশুদ্ধি আর পরকালীন মুনাফা হিসাবে পেতে পারে জান্নাতুল ফিরদাউস এবং সিদরাতুল মুনতাহায় আম্বিয়ায়ে কিরামসহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের চিরন্তন সাহচর্য। তাই দুনিয়াবী ব্যবসায় সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের চেয়ে পরকালীন ব্যবসার সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করা বহু বহু গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১৭]

২. পরকালীন জওয়াবদিহিতা সৃষ্টি: আত্মসমালোচনার সবচেয়ে বড় উপকার হলো– এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরকালীন জওয়াবদিহিতার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি তার প্রতিটি কর্মে মহান আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করার অনুভূতি রাখে, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই মহান আল্লাহর একজন মুখলিস ও মুত্তাকী বান্দায় পরিণত হয়। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাত হলে মাটিতে আক্ষেপের সাথে পদাঘাত করে নিজেকে বলতেন, 'বলো! আজ তুমি কি করেছ?'। মাইমুন ইবনু মেহরান বলতেন, 'মুত্তাকী ব্যক্তি সেই যে নিজের জওয়াবদিহিতা এমন কঠোরভাবে গ্রহণ করে যেন সে একজন অত্যাচারী শাসক'।[১৮]

৩. তাওবার সুযোগ লাভ: আত্মসমালোচনা পাপ থেকে তাওবাহ্ করার সর্বোত্তম মাধ্যম। যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে জানে সে মহান আল্লাহর হক্ব আদায়ে যেসব ত্রুটি করেছে, তা তার সামনে যখনই প্রকাশিত হয় তখনই সে তাওবাহ্ করার সুযোগ পায়।

৪. দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি: আত্মসমালোচনা মানুষকে নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। ফলে সে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যসমূহ পালনে বহুগুণ বেশি তৎপর হতে পারে।

৫. জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি: আত্মসমালোচনা জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় সজীব করে রাখে। অর্থাৎ- এর মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি আমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। পার্থিব জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টার নয়, এ জীবনের পরবর্তী যে অনন্ত এক জীবন, তার জন্য যে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে- আত্মসমালোচনা আমাদেরকে সর্বক্ষণ তা স্মরণ করায়।

৬. 'আমলনামায় সমৃদ্ধি অর্জন: সারাদিন অনাহারে থেকে সিয়াম পালন, রাতের ঘুম পরিত্যাগ করে তাহাজ্জুদ আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, মহান আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় ইত্যাদি ফরয ও নফল 'ইবাদত মুহাসাবার এক একটি মহৎ ফলাফল। ইমাম গাযালী

---

[১৪] *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন- ৪/৩৯৪।*
[১৫] *সূরা হূদ: ১১৪।*
[১৬] *জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫০৮৩।*
[১৭] *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন- ৩/৩৯৪ পৃ.।*
[১৮] *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন- ৩/৩৯৫।*

বলেন, 'ফজরের সালাত আদায়ের পর মানুষের উচিৎ নিজের অন্তরের উপর ব্যবসায়ীদের মত শর্তারোপ করা এবং বলা যে, হে অন্তর! আমার একমাত্র পুঁজি আমার বয়স। বয়স যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে ততই আমার পুঁজি নিঃশেষ হয়ে আসছে। আর তার সাথে ফিকে হয়ে আসছে অধিক লাভের আশাও। আজ আরো একটি নতুন দিন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আমার ব্যবসায় অধিক উন্নতি সাধনের জন্য। যদি আল্লাহ তা'আলা আজ আমার মৃত্যু দান করেন তবে তাঁর কাছে আমার কামনা থাকবে একটি দিনের জন্য হলেও দুনিয়ায় ফেরৎ যাওয়ার, যেন আমার 'আমলনামা আরও সমৃদ্ধ করতে পারি। সুতরাং আমার আত্মা! তুমি আপন হিসাব গ্রহণ করো কেননা তোমার মৃত্যু হবেই, তারপর হবে পুনরুজ্জীবন। তাই সাবধান! আবারো সাবধান! দিনটি তুমি নষ্ট করো না।[১৯]

৭. ছোট ও বড় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়াঃ মুহাসাবার ফলে কোনো পাপ দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

৮. দুনিয়াবী জীবনের চাহিদা হ্রাসঃ মুহাসাবার ফলে তাক্বদীরের প্রতি সুস্থির বিশ্বাস জন্ম নেয়। ফলে দুনিয়াবী যিন্দেগীর দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলতে পারে না। কোনো অলীক কামনা-বাসনা আমাদের বিচলিত করে না। ফলে দুনিয়াবী ধন-সম্পদ, পদবী-মর্যাদা লাভের জন্য আর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ারও প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

৯. ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনঃ আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের ত্রুটিগুলো ধরা যায়। ফলে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যতে আরো উন্নতরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে আত্মসমালোচনা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অবলম্বন করার অর্থ স্বীয় ভবিষ্যতকে অর্থপূর্ণ করে তোলা এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা। যা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়লাভ অনিবার্য করে তোলে।

১০. নিয়তের পরিশুদ্ধিঃ আত্মসমালোচনা এমন একটি অভ্যাস যা বান্দা ও মহান আল্লাহর মধ্যকার একটি গোপন লেনদেনের মতো। ফলে তাতে আত্মার পবিত্রতা ও নিয়তের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয় এবং অন্তর শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই ইখলাসপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আত্মসমালোচনা না করার ফলাফলঃ ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুহাসাবা পরিত্যাগ করার অর্থ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা। এতে মানুষের অন্তর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ- মুহাসাবা পরিত্যাগ করার ফলে দ্বীনের প্রতি তার শিথিলতা চলে আসে, যা তাকে নিশ্চিতভাবেই দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র আত্মগর্বী, প্রতারিত আত্মাই মুহাসাবা পরিত্যাগ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে কোনো কিছুর পরিণাম চিন্তা করে না। সমস্ত পাপ তার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয় হয়ে যায়। অবশেষে একসময় পাপ থেকে বেরিয়ে আসাটা তার কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কখনো যদি সে সৎপথের সন্ধান পায়ও, তবুও সে তার অন্যায় অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করে।[২০]

আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত হওয়ার উপায়ঃ

১. তাক্বওয়ার অনুভূতি জাগ্রত করাঃ আত্মসমালোচনার জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আল্লাহভীতি অর্জন করা। মহান আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, তাঁর মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ভীতির সাথে অবনত হওয়া পাপপ্রবণ আত্মাকে যেমন প্রশান্ত করে, তেমনি বিবেকের শাসনকে করে প্রবল। তাই জনৈক মনীষী বলেন, 'তোমার পাপকাজটি কত ছোট সে চিন্তা করো না; বরং চিন্তা করো তুমি কত বড় ও কত মহান একজন সত্তার অবাধ্যতা করেছ।'

২. 'আমলনামার হিসাব প্রদানের অনুভূতি জাগ্রত করাঃ এই অনুভূতি নিজের মধ্যে জাগ্রত করা যে, যদি আমার 'আমলনামা দুনিয়াতেই আমি হিসাব করে নেই তবে কিয়ামতের দিন আমার হিসাব প্রদান সহজ হয়ে যাবে;

[১৯] *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন- ৩/৩৯৪ পৃ.।*

[২০] *ইগাসাতুল লাহফান- ইবনুল ক্বাইয়িম, ১/৮২।*

আর যদি আত্মসমালোচনায় অবহেলা করি তার অর্থ হবে- কিয়ামত দিবসের হিসাব কঠিন হয়ে যাওয়া। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

اشترنفسك اليوم فان السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضايع يوم لا تصل فيها الى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن.

'তোমার আত্মাকে ক্রয় করো আজই, কেননা আজ বাজার সচল, দামও আয়ত্বের মধ্যে, পণ্য-সামগ্রী অনেক সস্তা। অচিরেই এই বাজার ও এই পণ্যসামগ্রীর উপর এমন দিন আসছে যেদিন সেখান থেকে ক্রয়ের আর কোনোই সুযোগ পাবে না। কেননা সেদিন হলো হালখাতার দিন (লাভ-ক্ষতি হিসাবের দিন)।'[২১]

৩. জান্নাত ও জাহান্নামকে স্মরণঃ মুহাসাবা করার অর্থ জান্নাতপ্রাপ্তি এবং মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের সৌভাগ্য অর্জন আর মুহাসাবা না করার অর্থ জাহান্নামের রাস্তায় ধাবমান হওয়া এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হওয়া- এই উপলব্ধি অন্তরের গভীরে বদ্ধমূল করে রাখতে হবে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন,

«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ».

'তুমি যখন সন্ধ্যা করবে তখন সকাল করার আশা করো না এবং যখন তুমি সকাল করবে তখন সন্ধা করার আশা করো না। অতএব অসুস্থতার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ করো এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনটাকে সুযোগ হিসাবে নাও।'[২২]

৪. আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করাঃ অর্থাৎ- নফসের গতি-প্রকৃতি, নফসের পাতানো ফাঁদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। নফস যে সামান্য সুযোগ পেলেই অকল্যাণ ও অনৈতিক কাজে প্ররোচিত করে তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তবে নফসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মানসিক শক্তি তৈরী হয়।

৫. দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনঃ শরীয়তের বিধি-বিধান তথা হক্ব-বাতিল, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা।

৬. নিজ সম্পর্কে সুধারণা পরিত্যাগ করাঃ এ ভয়াবহ রোগটির বিষময় ফলাফল এমনই যে, নিজের ভালো কাজকেই খারাপ আর খারাপ কাজকেই ভালো মনে হতে শুরু করে। এজন্য ইবনুল কাইয়িম বলেন,

ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه.

'নিজের প্রতি যে ব্যক্তি সুধারণা রাখে মূলত সে নিজ সম্পর্কে অজ্ঞতম ব্যক্তি।'

তাই নিজেকে সঠিক ও উঁচুস্তরের লোক মনে করে আত্মতৃপ্তি বোধ করা যাবে না। নতুবা নিজেকে অগ্রগামী করার তো সুযোগ থাকবেই না; বরং অচিরেই অনিবার্য ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হবে।

৭. নিজের 'আমলনামা পরিমাপ করাঃ নিজের সৎ 'আমল ও অসৎ 'আমলকে সওয়াব ও পাপের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা এবং কোনোটির ওজন ও প্রকৃতি কেমন তা যাচাই করা। এর ফলে মুহাসাবার অনুভূতি বিশেষভাবে জাগ্রত হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে হাশ্‌রের ময়দানে আমাদের কৃত অণু পরিমাণ পুণ্য এবং অণু পরিমাণ পাপও আমাদের 'আমলনামায় প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে।[২৩]

উপসংহার

'মুহাসাবাতুন নাফস' বা আত্মসমালোচনা নিজেকে শুধরে নেওয়া ও বদলে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। দুই চোখ দিয়ে মানুষ অন্যকে এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়। কিন্তু অন্তরের চোখে নিজের আয়নায় নিজেকে দেখতে পায়। আত্মসমালোচনার ফলে কোনো পাপ দ্বিতীয়বার করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। ☒

[২১] *আল ফাওয়ায়েদ- পৃ. ৪৯।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১৬।*
[২৩] *সূরা আয্ যিলযাল: ৭-৮।*

প্রবন্ধ

আল কুরআনে দুধ উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ

–ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

আল কুরআন নিছক কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। সাথে সাথে বিশ্বের সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও উৎস গ্রন্থ। এজন্য আল কুরআনের আবেদন সর্বকালে সর্বযুগে একই সমান।

দুধ পরিচিতি: স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুগ্ধ গ্রন্থি হতে নিঃসরিত এক প্রকার তরল পদার্থ হলো দুধ।

দুধ হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তন্যগ্রন্থি থেকে উৎপাদিত অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এক প্রকার সাদা তরল পদার্থ। এটি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল মানুষের একটি প্রধান খাদ্য।

দুধকে আরবিতে বলা হয় লাবান (لبن)। লাবান (لبن) শব্দটি আল কুরআনে দু'স্থানে এসেছে– সূরা আন্ নাহ্ল-এর ৬৬ নং আয়াতে এবং সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৫ নং আয়াতে।

অন্যান্য খাদ্যগ্রহণে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত স্তন্যপায়ী শাবকদের এটিই পুষ্টির প্রধান উৎস। স্তন থেকে উৎপন্ন দুগ্ধ প্রাথমিক পর্যায়ে কোলোষ্ট্রাম আমিষ ও ল্যাক্টোজ সমৃদ্ধ শালদুধ শাবকদেহে রোগ প্রতিরোধক। যা শাবকের রোগাক্রান্ত হবার ঝুঁকি কমায় ও পুষ্ট বৃদ্ধি ঘটায়।

কাঁচা দুধের পুষ্টির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে সম্পৃক্ত স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি।

দুধে পুষ্টি মূল্য: দুধে রয়েছে পানি (গ্রাম) ৮৭.৭, খাদ্যশক্তি (কিলো ক্যালরি) ৬৪, আমিষ (গ্রাম) ৩.৩, এ্যাশ (গ্রাম) ০.৭, ফ্যাট (গ্রাম) ৩.৬, কোলেস্টেরল (মিলিগ্রাম) ১১, পটাশিয়াম (মিলিগ্রাম) ১৪৪, ভিটামিন-এ (আই ইউ) ১৪০।

আল কুরআনের ব্রেস্ট ফিডিং: আল কুরআনের সূরা আল বাক্বারাহ্'র ২৩৩ নং আয়াতে মা তার শিশুকে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবেন। তবে এর বেশি নয়। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

অর্থ: "মাতৃগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবেন।"

অধুনা যুগের মাতৃগণ ব্রেস্ট ফিটিং রাখতে ব্রেস্ট ফিডিং না করিয়ে সন্তানদেরকে রোগ প্রতিরোধক আদর্শ খাদ্য থেকে বঞ্চিত করেন। একদিকে যেমন সন্তানের হক্ব নষ্ট করেন অন্যদিকে ব্রেস্ট ফিটিং এর নামে ব্রেস্ট ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানব শিশুর জন্য প্রথম ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ পান করাতে এবং দুই বছর বা তার অধিক বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের সাথে অন্যান্য খাবার খাওয়াতে সুপারিশ করে।

আল কুরআনে দুধ উৎপাদন-প্রক্রিয়া: আল কুরআনে সূরা আন্ নাহ্ল-এর ৬৬ নং আয়াতে দুধ উৎপাদন তথা এর প্রস্তুত প্রণালীর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৫ নং আয়াতে বেহেশ্তে যে কয়েক ধরনের পানীয় পান করানো হবে তন্মধ্যে একটি হলো দুধ। যার স্বাদ কখনো বিনষ্ট হবে না।

দুধ উৎপাদন:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ﴾

অর্থ: "অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ। আমি তোমাদেরকে পান করাই চতুষ্পদ জন্তুর পেটের গোবর ও রক্ত হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত খাঁটি সুস্বাদু দুধ।"[২৪]

দুধ যেসব উপাদানে তৈরি, সেসব উপাদান নিঃসৃত হয় "মামারী গ্ল্যান্ড" নামক দেহস্থিত একটি রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে। শরীরের সাধারণ পুষ্টির জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা পাওয়া যায় খাদ্য থেকে। খাদ্যবস্তু প্রথমে পরিপাকযন্ত্রে রাসায়নিক রূপান্তর সাধিত হয়ে তার সারবস্তু অন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়ে আবার রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরিত বস্তুটি একটি উপযুক্ত সময়ে অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে দেহের সরবরাহযন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়।

[পরবর্তী অংশ ৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

* *জমঈয়ত উপদেষ্টা, সাবেক ডিন ও প্রফেসর- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[২৪] *সূরা আন্ নাহ্ল: ৬৬।*

বিপদে পতিত হলে পাঠ করুন “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন”

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

অত্র প্রবন্ধ লেখার শিরোনামটি মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে চয়ন করা হয়েছে–

﴿اَلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾

যার অর্থ হচ্ছে– “যাদের উপর কোনো বিপদ-আপদ আসলে তারা বলে– ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী’।”[২৫]

আয়াতের অর্থ মোতাবেক পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারি যত প্রকার বালা-মুসিবত আছে তা আমাদের উপর আপতিত হলে ধৈর্যহারা না হয়ে সাধ্যমতো ধৈর্য ধরতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উপর সন্তুষ্ট থেকে বলতে হবে– “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন”। কিন্তু বাস্তবে আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করি তারা অধিকাংশই এ আয়াতটি মানুষের মৃত্যু সংবাদ শুনে বলে থাকি। বাকী বিপদ-আপদগুলোর কারণ খুঁজে তার সমাধান করার জন্য উঠে পড়ে লেগে থাকি এমনকি কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত ও ধর্না দেই সমাধানের জন্য। অথচ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন–

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾

“নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করবো তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও শস্যের ঘাটতির কোনো একটি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো।”[২৬] অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টতই বলেছেন–

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

“আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ, মুসিবত আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।”[২৭]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! উপরোক্ত আয়াতগুলোর অর্থের মাধ্যমে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি সেটি হচ্ছে– সকল প্রকার বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ সবই মহান রাব্বুল ‘আলামীনের অনুমতি সাপেক্ষে সাংঘটিত হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না, এমনকি আমাদের চলতে যেয়ে যে হোচট লাগে, কাঁটা পর্যন্ত ফুঁটে সেটিও আল্লাহর অনুমতি মোতাবেক হয়ে থাকে। আর এগুলোর মাধ্যমেই তিনি মু’মিনদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এটাই হলো আল্লাহর রীতি। কেননা সবসময় যদি মু’মিনরা সুখ-সাচ্ছন্দে থাকে তাহলে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়েও যেতে পারে এবং তাঁর নিয়ামতের মূল্যায়ন না-ও করতে পারে। তাই তিনি বলেছেন–

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾

“তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো।”[২৮]

অর্থাৎ- যারা এসব বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অবশ্য এ ধৈর্য বিপদের শুরুতেই করতে হবে, পরে ধরলে এ সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল না-ও হতে পারে। কারণ হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى.

“ধৈর্য হলো বিপদের শুরুতেই।”[২৯] সুতরাং যারা যে কোনো ধরনের বিপদ-আপদের শুরুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারে তাদের জন্য রয়েছে এ সুসংবাদ।

মুসিবত বা বিপদ কাকে বলে?

সংক্ষেপে মুসিবত বা বিপদ বলতে ঐ বিষয়গুলোকে বোঝায় যা মু’মিনদেরকে কষ্ট দেয়, তাই সেটি শারীরিক হোক বা মানসিক হোক অথবা উভয়টাও হতে পারে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন–

---

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[২৫] *সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৬।*

[২৬] *সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৫।*

[২৭] *সূরা আত্ তাগা-বুন: ১১।*

[২৮] *সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৫।*

[২৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩০২; সহীহ মুসলিম- হা. ৯২৬।*

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ.

একজন মু'মিন যখন কোনো কষ্ট, ব্যথা, অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতায় আক্রান্ত হয় আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৩০]

তবে সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো দীনের জন্য বিপদাপন্ন হওয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন–

"তোমাদের কেউ মুসিবতে পতিত হলে সে যেন আমার মুসিবতের কথা স্মরণ করে, কারণ এটা সবচেয়ে বড় মুসিবত।"[৩১]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! মু'মিনদেরকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদে আক্রান্ত করে পরীক্ষা করেন তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা। আর কিছু নয়, আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা এভাবে জীবন-যাপন করতে পারি তাহলে এর সুফল ইহকালে তো পাবই পরকালেও পাবো। প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

"যারা এ সকল মুসিবতে ধৈর্য দারণ করবে তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৩২]

এটি তিনি বাস্তবেও দেখিয়েছেন। যেমন- উম্মু সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমার স্বামী আবূ সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবার হতে আমার নিকট আসেন এবং অত্যন্ত খুশিমনে বলেন: আজ আমি এমন একটি হাদীস শুনেছি যা শুনে তুমি অবশ্যই খুশি হবে। হাদীসটি হচ্ছে এই যে, যখন কোনো মুসলমানের উপর কোনো কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে এবং সে পড়ে– "আল্ল-হুম্মা' আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা-", অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আমরা এই বিপদে আমাকে প্রতিদান দিন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন।[৩৩]

উম্মু সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি এই দু'আটি মুখস্থ করে নেই। অতঃপর আবূ সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ইন্তেকাল হলে আমি "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জিউন" পাঠ করি এবং এই দু'আটিও পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবূ সালমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অপেক্ষা আর ভালো মানুষ আমি কাকে পাবো? এমতাবস্থায় আমার 'ইদ্দত' অতিক্রান্ত হলে আমি একদিন আমার একটি চামড়া সংস্কার করতে থাকি। এমন সময়ে স্বয়ং মহানবী (ﷺ) আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি তখন চামড়াটি রেখে দিয়ে হাত ধুয়ে নেই এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ভিতরে আসার প্রার্থনা জানাই। তাঁকে একটি নরম আসনে বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি বলি– হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু প্রথমতঃ আমিতো একজন লজ্জাবতী নারী। না জানি হয়তো আপনার স্বভাবের উল্টো কোনো কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় এবং এরই কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার শাস্তি হয় না-কি! দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: দেখো! আল্লাহ তা'আলা তোমার এই অনর্থক লজ্জা দূর করে দেবেন। আর বয়স আমারও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে-মেয়ে যেন আমারই ছেলে-মেয়ে। আমি এ কথা শুনে বলি– "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।" অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং এই দু'আর বরকতে আমার পূর্ব স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ- স্বীয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দান করেন। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য।

অনুরূপ আবূ সিনান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন: আমি আমার একটি শিশুকে সমাধিস্থ করি। আমি তার

[৩০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৭৩।*
[৩১] *সহীহুল জামে'- হা. ৩৪৭।*
[৩২] *সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৭।*
[৩৩] *মুসনাদ আহমাদ।*

কবরেই রয়েছি এমন সময়ে আবূ তালহাহ্ খাওলানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার হাত ধরে উঠিয়ে নেন এবং বলেন, আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দেবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মরণের ফেরেশ্তা! তুমি আমার বান্দার ছেলে তার চক্ষুর জ্যোতি এবং কলিজার টুকরোকে ছিনিয়ে নিয়েছো? ফেরেশ্তা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তখন সে কি বলেছে?' ফেরেশ্তা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার জন্যে বেহেশ্তে একটি ঘর তৈরি করো এবং ওর নাম 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর রেখে দাও।[৩৪]

সুতরাং যাবতীয় বালা-মুসিবতে তথা সকল প্রকার বিপদ-আপদে আমাদের "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জিউন" বলতে হবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

"যারা এই ছোট্ট আয়াতটি সকল প্রকার বিপদ-আপদে বলে তাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে থাকে প্রশংসা ও রহমত। আর তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

হাদীসেও এসেছে যে,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا. إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا".

কোনো মুসলিমের ওপর মুসিবত আসলে যদি সে বলে আল্লাহ তা'আলা যা হুকুম করেছেন– "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জিউন", অর্থাৎ- "আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তারই কাছে ফিরে যাব" বলে এবং এ দু'আ পাঠ করে– "আল্ল-হুম্মা' আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা-", অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করো এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করো", তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন।[৩৫] ☒

[৩৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[৩৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯১৮।*

বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় খতমে ইউনুস পাঠ

[২৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

আর নিকৃষ্টতম কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হলো ভ্রষ্টতা'।[৩৬] আর আন্ নাসায়ীতে রয়েছে– 'প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম।'[৩৭] (আল্লাহ আমাদেরকে সব ধরণের বিদআত ও গোমরাহি থেকে হিফাযাত করুন –আমীন।)

ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন: আমাদের সমাজে বিভিন্ন প্রকারের 'খতম' প্রচলিত আছে। এ ধরনের খতমের নিয়ম, ফযীলত ইত্যাদির বিবরণ 'মকসুদুল মু'মিনীন', 'নাফেউল খালায়েক' ইত্যাদি বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দু'টি কারণে 'খতম' পাঠ করা হয়:

(১) বিভিন্ন বিপদাপদ কাটানো বা জাগতিক ফল লাভ।

(২) মৃতের জন্য সাওয়াব পাঠানো।

উভয় প্রকারের খতমই 'বানোয়াট' ও ভিত্তিহীন। এ সকল খতমের জন্য পঠিত বাক্যগুলো অধিকাংশই খুব ভালো বাক্য। এগুলো কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহসম্মত দু'আ ও যিক্র। কিন্তু এগুলো এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার পাঠের কোনো নির্ধারিত ফযীলত, গুরুত্ব বা নির্দেশনা কিছুই কোনো সহীহ বা য'ঈফ হাদীসে বলা হয়নি। এ সকল 'খতম' সবই বানোয়াট। উপরন্তু এগুলোকে কেন্দ্র করে কিছু হাদীসও বানানো হয়েছে। 'বিস্মিল্লা-হ' খতম, দু'আ ইউনুস খতম, কালিমাহ খতম ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের। বলা হয় 'সোয়া লাখবার 'বিস্মিল্লা-হ' পড়লে অমুক ফল লাভ করা যায়' বা 'সোয়া লাখবার দু'আ ইউনুস পাঠ করলে অমুক ফল পাওয়া যায়' ইত্যাদি। এগুলো সবই বুজুর্গদের অভিজ্ঞতার আলোকে বানানো এবং কোনোটিই হাদীস নয়।

তাসমিয়া বা (বিস্মিল্লা-হ), তাহলীল বা (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও দু'আ ইউনুস এর ফযীলত ও সাওয়াবের বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে এগুলো ১ লক্ষ, সোয়া লক্ষ ইত্যাদি নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করার বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। "খতমে খাজেগানের" মধ্যে পঠিত কিছু দু'আ সুন্নাহসম্মত ও কিছু দু'আ বানানো। তবে পদ্ধিতিটি পুরোটাই বানানো।" *[সূত্রঃ বই- হাদীসের নামে জালিয়াতি]*

[৩৬] *সহীহ মুসলিম, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪১।*

[৩৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮।*

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভের সরল পথ

–মিজানুর রহমান বিন আব্দুল ওয়াজেদ*

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, কল্যাণ ও পূণ্য লাভের সংক্ষিপ্ত ও সহজতম পথ হলো মহান আল্লাহর মাখলুকের প্রতি বিশেষ করে মানুষের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে তার বান্দাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

"যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার সহযোগিতায় রত থাকবেন।"[৩৮]

উপরে বর্ণিত হাদীসটির দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ মহান আল্লাহর কোনো বান্দাকে সাহায্য করলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন। সুতরাং আমাদের সবার উচিৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করা। আর আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে সাহায্য-সেবা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সেবা করা হয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাওনি, সে বলবে, হে রব্ব! আপনি তো রাব্বুল 'আলামিন, আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে যাব? তিনি বলবেন, তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, তবুও তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকে তার কাছে পেতে।

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি। সে বলবে, হে রব্ব! আপনি তো রাব্বুল 'আলামীন, আমি কিভাবে আপনাকে খাদ্য দিব? তিনি বলবেন, তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাদ্য দিতে তবে আমার নিকট তা পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। সে বলবে, হে রব্ব! আপনি তো রাব্বুল 'আলামীন, আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করতে দিব? তিনি বলবেন, তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে আমার নিকট তা পেতে।[৩৯]

আলোচ্য হাদীসটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, বান্দাকে সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সেবা করা হয়। এজন্য প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির করণীয় হলো মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা, মানব কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখা, মানুষের উপকার করতে না পারলে অন্তত ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা। রাসূল (ﷺ) বলেন,

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! যদি কারো দান করার মতো কিছু না থাকে? তিনি বললেন, সে নিজ হাতে কর্ম করবে, যে উপার্জন দিয়ে সে নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যকে দান করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়? তিনি বলেন, তাহলে সে কল্যাণমুখী কর্ম করবে এবং অকল্যাণকর কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এই কর্মও তার জন্য দান-সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হবে।[৪০]

জনকল্যাণমূলক কাজে দান করার গুরুত্ব অপরিসীম। কারো-নিকট দান করার মতো অর্থ-সম্পদ না থাকলে, সে প্রয়োজনে নিজ হাতে উপার্জন করে হলেও দান-সাদাক্বাহ্ করবে। মানুষের কোনো উপকার সাধন করতে না পারলে অন্তত কারো ক্ষতি করা সমিচীন নয়। আর সাহায্য-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ইয়াতীম-অনাথ, বিধবা ও সমাজের দূর্বল শ্রেণির মানুষদের প্রাধন্য দেয়া উচিৎ। কারণ সমাজের এ দূর্বল শ্রেণিগুলোর সেবা ও অধিকার রক্ষার চেষ্টার জন্য রয়েছে বিশেষ সওয়াব ও মর্যাদা। রাসূল (ﷺ) বলেন,

---

* *আরবি, প্রভাষক, মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।*

[৩৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯, ২৭০০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৫৫, ৪৯৪৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৫; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৭৩৭৯; সুনান আদ্ দারেমী- হা. ৩৪৪।*

[৩৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৯; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ২৬৯।*

[৪০] *সহীহ মুসলিম- মাকবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড, হা. ১০০৮, পৃ. ৩২৫।*

"যে ব্যক্তি ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণ বা লালনপালন করে সে আমার সাথে পাশাপাশি জান্নাতে থাকবে, একথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনীকে পাশাপাশি রেখে দেখান।"[৪১]

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইয়াতীম-অনাথদের শুধু ঠকানোর ফন্দিফিকির করা হয়। তাদের সম্পদ কিভাবে গ্রাস করা যায় এমন চিন্তা অনেকের মাথায় থাকে। ইয়াতীমের লালন-পালন তাদের স্বার্থরক্ষার কাজ করা কত সওয়াব ও মর্যাদার কাজ তা আমরা বুঝি না বা বুঝতে চেষ্টা করি না। অথচ ইয়াতীমের লালন পালনকারী, সাহায্য-সহযোগিতাকারী; স্বয়ং রাসূল (ﷺ)-এর সাথে জান্নাতে পাশাপাশি থাকবেন। আর বিধবা, অসহায়-দরিদ্র সমাজের এরূপ অবহেলিত মানুষের কল্যাণ সাধন ও স্বার্থ রক্ষার কাজ করা অত্যান্ত সওয়াবের কাজ। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"বিধবা ও দরিদ্রদের স্বার্থসংরক্ষণ বা কল্যাণের জন্য চেষ্টারত মানুষ মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত, বিরামহীন তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং অবিরত সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির ন্যায়।[৪২]

যিনি বিধবা ও দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতা করেন, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজ করেন, তিনি অকল্পনীয় সওয়াব লাভ করেন। একজন মানুষ মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করে, বিরামহীন (নিয়মিত) তাহাজ্জুদ আদায় করে, অবিরত সাওম পালন করে যতটা সওয়ার লাভ করেন, ঠিক ততটা সওয়ার ও মর্যাদা লাভ করেন। যিনি বিধবা ও দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষার কাজ করেন।

মানব কল্যাণমূখী কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখা একটি মহৎ কাজ। যা মানুষকে বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

মানব কল্যাণমুখী কর্ম বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, গোপন দান মহান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আয়ু বৃদ্ধি করে।[৪৩]

আমরা সমাজে বসবাস করি। অনেক সময় সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ বা অশান্তি সৃষ্টি হয়। তখন আমাদের উচিৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং মহান আল্লাহকে ভয় করে যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"[৪৪]

দু'জন ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেয়াকেও হাদীসে সাদাক্বাহ্ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"দু'জন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ন্যায়-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা দান বলে গণ্য, কোনো মানুষকে তার বাহণ নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে সাহায্য করা সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য, কারো বাহনে তার জিনিসপত্র তুলে দেওয়া দান বলে গণ্য, সুন্দর আনন্দদায়ক কথা দান বলে গণ্য, মসজিদে গমনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ দান বলে গণ্য এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেয়া দান বলে গণ্য।"[৪৫]

টাকা-পয়সা দিয়েই শুধু মানুষের উপকার করা যায়, বিষয়টা এমন নয়। একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের নিকট একটুখানি শান্তনার বাণী শুনানো, সুন্দর আনন্দদায়ক কথার মাধ্যমে কারো মুখে হাসি ফোটানো বা সুন্দর পরামর্শ দিয়ে কারো কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা একটা বড় উপকার। যা টাকা-পয়সার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। আমাদের সকলের উচিৎ সাধ্যানুযায়ী মানুষের উপকার করা, বিপদের সময় পাশে বসে শান্ত্বনা দেওয়া এগুলো মহত্বেরই পরিচায়ক। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই সব বান্দাই সবচেয়ে প্রিয় যারা মানুষের উপকার করে। আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) বলেছেন,

"মহান আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক 'আমল হলো কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোন ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে, অর্থাৎ- মসজিদে নববীতে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। কেউ নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যাক্তি তা সংবরণ করবে, কিয়ামতের দিন মহিমাময় আল্লাহ তার অন্তরকে নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার

---

[৪১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০০৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- আনওয়ারুন মিশকা-ত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৪৭৩৫, পৃ. ২২৯।*

[৪২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০০৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৮২; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- আনওয়ারুল মিশকা-ত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৪৭৩৪, পৃ. ২২৭।*

[৪৩] *মাজমাউয যাওয়াইদ- হায়সামী, ৩/১১৭; আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- আল মুনযিরি, ২/৬৯; হাদীসটি হাসান।*

[৪৪] *সূরা আল হুজুরা-ত: ১০।*

[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৮৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১০০৯।*

প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলসিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। সিরকা বা ভিনিগার যেমন মধু নষ্ট করে দেয় তেমনিভাবে অসৌজন্যমুলক আচরণ মানুষের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়।"[৪৬]

আল্লাহর বান্দার সেবা করার চেয়ে, তার নিকট প্রিয় কর্ম আর কিছুই নেই। কেউ যদি রাস্তা হতে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়, এই একটি মাত্র কাজ তার সারা জীবনের সগীরাহ গুনাহগুলো মাফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। আর হতে পারে তার জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"এক বাক্তি রাস্তা চলতে চলতে একটি কাটাওয়ালা ডাল দেখতে পায। সে ডালটি সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে মাফ করে দেন।"[৪৭]

অন্য একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন,

"যদি কেউ রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয় তবে তার 'আমল নামায় একটি নেকি লেখা হয়। আর যদি কারো একটি নেকিও কবুল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪৮]

"যারা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ বা অমায়িক ব্যবহার করেন। মানুষ যেমন তাদেরকে ভালোবাসেন ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা ও তাদের ভালোবাসেন। এই সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষ সমূহকল্যাণ লাভ করে থাকে এবং এর দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"যদি কেউ বিনম্রতা ও নম্র আচরণ লাভ করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে পাওনা সকল কল্যাণই লাভ করল আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্নীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সুন্দর আচরণ বাড়িঘর ও জনপদে বরকত দেয় এবং আয়ু বৃদ্ধি করে।"[৪৯]

মানুষের সাথে সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়ে নফল সওম ও তাহাজ্জুদ নামাযের সওয়াব লাভ করা যায়। শুধু তাই নয় এটি হবে মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী 'আমল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"কিয়ামতের দিন মু'মিনের 'আমলনামায় সুন্দর আচরণের চেয়ে অধিক ভারী 'আমল আর কিছুই হবে না। যে ব্যাক্তি অশ্লিল ও কটু কথা বলে বা অশোভন আচরণ করে তাকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন। আর যার ব্যবহার সুন্দর সে তার ব্যবহারের কারণে নফল সওম ও তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করে।"[৫০]

সুন্দর আচরণ মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী 'আমল এবং এর দ্বারা নফল সাওম ও তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করা যায়। তাই তো সুন্দর আচরণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। হাদীসে নববীতে এসেছে,

"সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তা হলো মহান আল্লাহর ভয় এবং সুন্দর আচরণ। আর সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে তা হলো মুখ এবং যৌনাঙ্গ।"[৫১]

আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে হলে মানুষের সাথে সদাচারণ করতে হবে। এ সদাচরণই হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সহজ পথ তাই তো যারা মহান আল্লাহর বান্দাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে, তারা জান্নাতের সবচেয়ে উচু মাকামে স্থান লাভ করবে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

"নিজের মতামত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যে বিতর্ক পরিত্যাগ করে আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা পরিহার করে, হাসি-তামাশাচ্ছলেও মিথ্যা বলেনা তার জন্য আমি জান্নাতের মধস্থলে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য সর্বোচ্চ জান্নাতে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি।"[৫২]

সম্মানিত পাঠকগণ! আমরা অনেকে নফল সালাত, নফল সাওম, যিক্‌র, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি 'ইবাদতের সাওয়াব সম্পর্কে যতটুকু সচেতন, মানব সেবার ফযীলত, গুরুত্ব ও সাওয়াব সম্পর্কে আমরা মোটেও সচেতন নই। অথচ মহান আল্লাহর বান্দাদের সেবা ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়া যায়। আর এটি আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথও বটে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে মানব সেবামূলক কাজে নিয়জিত থাকার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। ☒

---

[৪৬] *আল মু'জামুল আওসাত- তাবারানী, হা. ৬০২৬; সহীহুল জামে'- আলবানী, হা. ১৭৬, হাদীসটি হাসান।*

[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৭২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৫৩৭।*

[৪৮] *তাবারানী- হা. ২০/১০১, ১৯৮; শুয়াবুল ঈমান- বায়হাক্বী, হা. ১১১৭৪; সহীহুল জামে'- আলবানী, হা. ৬২৬৫, হাদীসটি হাসান।*

[৪৯] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫২৫৯; সহীহুত্ তারগীব- আলবানী, হা. ২৫২৪, হাদীসটি সহীহ।*

[৫০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০০৩; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৯৯; হাদীসটি সহীহ।*

[৫১] *তিরমিযী- হা. ২০০৪; ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৪৬, হাসান।*

[৫২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭০০; সহীহুল জামে'- আলবানী, হা. ১৪৪৬; হাদীসটি হাসান।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

দূষণচক্রে জেরবার: উৎকণ্ঠায় নগরবাসী

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পঞ্চম পর্ব]

দূষণের বহুধা ধরণ মানবসমাজকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরেছে। এই দূষণচক্রের অবিরাম ছোবলে আমরা প্রায় সবাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। বায়ুদূষণ, খাদ্যদূষণ, জলদূষণ, মাটি দুষণ, শব্দ দূষণ –এই দূষণের রকমারিতা জীবনের চাকাকে স্থবির করে তুলেছে। সম্মানীয় পাঠকবৃন্দ! ইতিপূর্বে পাঁচ/সাত কিস্তিতে দূষণ বিষয়ে আলোকপাত করেছি। ইঙ্গিত ছিল সাবধান ও সতর্ক হওয়ার জন্য। কিন্তু এ নিয়ে আরও বহু বিষয় ছিল যা অনুক্ত থেকে গেছে। সে সকল বিষয়ে যৎসামান্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

শৈশবকালে চিকিৎসক কিংবা ফার্মেসী বড় একটা চোখে পড়তো না। গ্রাম্য ডাক্তারদের চিকিৎসায় রোগ-ব্যাধি নিরাময় হতো। জনৈক তারাপদ ডাক্তারের কথা এখনো মনে পড়ে। তিনি রাজশাহী থেকে আমাদের গ্রামে মাসেরপর মাস থেকে চিকিৎসা দিতেন। দেখতাম প্রায় প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসতেন। আলাপচারিতার মাধ্যমে অসুস্থতার বিষয় শুনে পাড়া-পড়শিদের রোগ নিরাময়ে ভূমিকা রাখতেন। এছাড়া আরো ছিলেন পাশের গ্রাম চ্যাংমারীর শামসুল ডাক্তার, লক্ষীরহাটের শুকুর ডাক্তার। এদের আনাগোনায় বড় ধরনের রোগ-ব্যাধি কিংবা একেবারে বেহাল অবস্থা হতো না। অবশ্যি রোগ-ব্যাধিও কম ছিল, মানুষ ভালো খেতেন। উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যে তখনও ভেজাল ছিল না। কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার কিংবা কীটনাশকের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। একেবারেই অর্গানিক। আমার মনে পড়ে আব্বাকে দেখেছি বিনামূল্যে কীটনাশক ঔষধ আনতে। কালে ভদ্রে আখ খেতে দিতে দেখেছি। আব্বার বড় গৃহস্থী ছিল। তিন চারটে হাল ছিল। ছিল দাই ভরা গরু। অর্থাৎ- ধান মাড়াইয়ের জন্য দু'সারিতে অন্ততঃ পনেরটি গরু। তাও প্রায় গৃহস্থের ছিল। বিকেল বেলা উনুনে চড়ানো সরাইতে পুরু দুধের সরভেদ করে দুধ পান করতাম। পানির বদলে পেট ভরে খাঁটি দুধ শরীরকে রাখতো তরতাজা। দুধকে বলা হয় সুপার ফুড। তা সর্বগুণসম্পন্ন পানীয়। এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন, ভিটামিন-এ, নিয়াসিন, রিবোফ্লাভিন। দুধ ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ, যা ক্যালসিয়াম ধরে রাখে এবং হাড় মজবুত করে। দুধে রয়েছে ভিটামিন বি-১২, যা লোহিত কনিকা উৎপাদন করে, শরীরের স্নায়ুবিক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুধে থাকা ভিটামিন-এ দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

তখনকার সময় টাটকা শাক-সব্জী ও ঢেঁকিতে বানা চাল, খাল-বিলের মাছ মানুষকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা দিতো। আমাদের বাড়ির সামান্য পূর্বে গোরকই বিল। একটু জায়গা ঘিরে পানি সেচ দিলেই দু'পাঁচ কেজি মাছ পাওয়া যেত।

বছর ষাটেক আগের কথা। কোনো এক বিকেলে আব্বা বললেন চল যাই মাছ ধরব। ওই গোরকই বিলে। সেখানে বিলের অপ্রশস্থ এলাকায় একটা সাঁকো ছিল। আমরা স্থানীয় ভাষায় সাখু বলতাম। বাপ-বেটা সাখুতে গেলাম। আব্বার হাতে ফেকাজলি (ভূয়ারি জাল) আর আমার হাতে একটা ঘটি। আব্বা সাখু বরাবর প্রটেকশন পিলারে নেমে জাল ফেললেন। জাল টানার পর দেখি জাল ভরা কৈ মাছ। শুধুই কৈ আর কৈ! তাতে ঘটি ভরে গেল। আব্বা বললেন, চলো, হয়েছে'। তিনি দ্বিতীয়বার জালই ফেললেন না। নির্ভেজাল আমিষ-নিরামিষ তরকারির প্রাচূর্য মানুষকে রাখতো নিরোগ ও সুস্বাস্থের অধিকারী করে।

হালে আমরা কী দেখছি? খাচ্ছিই বা কী? সুস্বাদু ও উপকারী ব্যাঞ্জন হিসেবে শুটকির প্রচলন সব দেশেই। আমাদের দেশেতো বটেই। আম্মাকে দেখেছি কুলা কিংবা ধান চালুনিতে মাছ শুকাতে। আর আজ শুটকি করতে গিয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে ডি ডি টি। ডিডিটি মূলত এক ধরনের কীটনাশক। ২০০১ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত Stockholm Convention on Persistent Organic Potlutants সম্মেলনে ডি ডি টি-সহ ক্ষতিকারক কীটনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ বা সীমিত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেখানে ১৭১টি দেশ চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সাল থেকে তা কার্যকর হয়।

অধুনা শুটকি পল্লীতে এর বহুল ব্যবহারের ফলে মানুষজন চর্মরোগসহ নানা প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

* **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ। **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের ভাষ্যমতে শুটকিসহ বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে ডি ডি টি আমাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে মানবদেহের জনন অঙ্গগুলো অকেজো করে দেয়। যার ফলে পুরুষের জনন অঙ্গের পুংজনন কোষের উৎপাদন কমে যায় এবং সন্তান জন্মদান ক্ষমতার হ্রাস ঘটে। নারীদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ডিডিটি ছাড়া শুটকিতে Metolachor স্প্রে করা হয়। এটি মানবদেহে প্রবেশ করলে চর্মরোগসহ লিভার ও কিড্নীকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই হলো ভোজনরসিকদের প্রিয় শুটকির অবস্থা!।

আমরা ছোট কালে দেখেছি একেবারে নিভৃত গ্রাম অবস্থিত হাটগুলোতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ খাদ্য পরীক্ষা করতেন। দুধ, মাছ-মাংস, পরখ করতেন। দুধ ল্যাক্টোমিটার দিয়ে খাঁটি কি-না তা দেখতেন। মাছে ফরমালিন ব্যবহার হচ্ছে কি-না –এ সকল আদ্যপান্ত দেখতেন। অথচ আজ যেন কেউ দেখার নেই। মাছ-মাংস, সব্জী ও দুধ ইত্যাদিকে তরুতাজা রাখার জন্য দেদারসে ফরমালিনের ব্যবহার হচ্ছে। খাদ্যে খুব সামান্য ব্যবহৃত ফরমালিন মানুষের শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকর। ফরমালিন মেশানো ফল বা মাছ-মাংস দীর্ঘদিন ধরে খেলে লিভার ক্যান্সার, হার্টের অসুখ, এমনকি কিডনি নষ্ট হতে পারে। এভাবে খাবারে নানা ধরনের বিষাক্ত রাসয়নিকের ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্য রীতিমত ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। দ্বারস্থ হচ্ছে চিকিৎসকদের কাছে।

খাদ্যে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য মানুষকে নাজেহাল করে তুলেছে। অভিজাত ক্লাব কিংবা বনেদি পরিবারের কোনো উৎসবের উদ্বৃত্ত-উচ্ছিষ্ট খাবার মানবশরীরে নানা রোগ ব্যাধির সৃষ্টি করছে। ভিক্ষুক-ভবঘুরে কিংবা দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা এ ধরনের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বাড়ছে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ। রাস্তার ধারের হোটেল-রেস্তোরায় উন্মুক্ত খাবার, খাবার প্রস্তুতকারীর অপরিচ্ছন্নতা, রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ সব মিলিয়ে নানা ধরনের ক্ষতিকর জীবানু রোগ-ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকা ক্যান্টিনের খাবারে প্রাণনাশী ব্যাকটেরিয়া-ই-কোলাইসহ ১৪ ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। গবেষক দল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ক্যান্টিন থেকে আলুর ভর্তা ও মুরগির মাংসের নমুনা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে চারটি ক্যান্টিনের খাবারে উচ্চমাত্রার ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পায় তারা। গবেষণায় দেখা যায়, মুরগির মাংস ও আলুর ভর্তায় পাওয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো অধিকাংশই ঔষুধ প্রতিরোধী ও মারাত্মক। মুরগির মাংসের চাইতে আলুর ভর্তায় ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বেশি। মুরগির মাংসে কোস্ট্রিডিয়াম ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য রয়েছে। ব্যাকটেরিয়াগুলো মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হিসেবে বলা হয়েছে। প্রাপ্ত ১৪ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বেশি ক্ষতিকারক ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আই আই ডি সি আর ২০১৯ সালের এক গবেষণায় বলেছে, ই-কোলাই প্রায় সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এই ব্যাকটেরিয়া এতটাই শক্তিশালী যে, মানবদেহে সংক্রমন ঘটিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। ওই দু'ধরনের খাবারেই 'প্রোটিয়াস-ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। কিড্নিতে পাথর জমাতে এই ব্যাকটেরিয়া অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও ক্লেবসিয়েলা, সালমোনেলা, ভিব্রিও প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট নানারোগে মানুষকে আক্রান্ত হয়।

মুসকিল হলো শুধু খাদ্যে ওই সকল ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় না। বিদ্যমান পরিবেশও সে সকল ব্যাকটেরিয়া বহনের জন্য দায়ী। যেমন- টাকা। টাকা ছাড়া জীবন যেন অচল। টাকা হাতে নিতে হয়, গুনতে হয়। দ্রুত গুনতে গিয়ে আঙ্গুল ভিজাতে হয়; কখনো বা মানিপঞ্জ আর মুখের জিভ তো আছেই। সুপ্রিয় পাঠক! এই টাকাতে ভরা আছে ই-কোলাই ও ফেকাল কলিফর্ম-জাতীয় ব্যাকটেরিয়া –যা স্বাস্থের জন্য বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত 'স্টাডি অনদ্য ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন অন পেপার মানি অব কয়েন্স অব খুলনা সিটি এরিয়া' শিরোনামের গবেষণা পত্রে দেখা যায় লোমহর্ষক চিত্র। মাছ, মাংস, মুরগি, জুস, ফুচকা প্রভৃতি দোকান ও ভিক্ষুকের কয়েনসমূহে ১০০০ থেকে ২৯০০ কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। জীবানু ই-কোলাই ও ফেকাল কলিফম হলো মলের জীবানু।

টাকা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে বাহিত জীবানু ই-কোলাই ও ফেকাল কলিফর্মের সন্ধান আমাদের আরো বিব্রত করে তোলে। বাসের, মেট্রোরেলের হ্যান্ডেল, রিকসা, ট্যাক্সি-ট্রেন প্রভৃতির হাতলতো সে সকল জীবানুর রাজ্য। আর পরিচ্ছন্ন না হওয়ার ফলে সে সকল জীবানু মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে অনিরাময়যোগ্য নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সুতরাং এখনি সময়। সদা পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। হাত-মুখ ধুতে হবে। পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পরিধেয় বস্ত্র। বর্তমানে বাহিত বারনত অতিক্ষুদ্র কণার মাত্রা বাংলাদেশের আদর্শ মান প্রতিঘনমিটারে ৬৫ মাইক্রোগ্রামের চাইতে চার-পাঁচ গুন বেশি। সুতরাং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় রোগ বাসা বাঁধবে শরীরে। *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

সাহাবা চরিত

একজন মহিয়ষী নারী
উম্মুল হাকীম বিনতুল হারেস

–আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী*

ইসলামী দাওয়াত ও জিহাদের পথে অবদান রাখার কারণে যুগে যুগে যেসব নারী কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় থাকবে, তাদের মধ্যে ইকরিমা ইবনু আবূ জাহেলের স্ত্রী উম্মুল হাকীম বিনতুল হারেস অন্যতম। তিনি ছিলেন বিরল প্রজ্ঞা ও সুগভীর মেধার অধিকারী একজন ধার্মিক মহিলা সাহাবী। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি দ্বীনের সেবায় নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রেখেছেন। বেশ কিছু যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুজাহিদদেরকে পানি পান করানো, আহতদেরকে চিকিৎসা সেবা দেয়া এবং যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করাসহ কল্যাণমূলক নানা কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বিভিন্ন জিহাদে কাফির-মুশরিকেদের সাথে সসস্ত্র যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি জাহেলী যুগে ইকরিমা ইবনু আবূ জাহেলকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের সময় অন্যান্য নারীদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বাইআত গ্রহণ করেন।

মূসা ইবনু ‘উক্ববাহ্ ইমাম যুহরী থেকে স্বীয় মাগাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল হাকীম বিনতু হারেস মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উম্মুল হাকীম কাফির থাকা অবস্থায় মক্কার কাফির-মুশরিকদের পক্ষে এবং মুসলিমদের বিপক্ষে উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তার স্বামী ইকরিমা মক্কা বিজয়ের দিন প্রাণ রক্ষার্থে ইয়ামান হয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ার দিকে পালিয়ে গেলো। কারণ, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেসব কাফিরের রক্ত হালাল ও মূল্যহীন ঘোষণা করেছিলেন, ইকরিমা ইবনু আবূ জাহেল তাদের মধ্যে গণ্য ছিল। সে ছিল উম্মুল হাকীমের স্বামী ও চাচাতো ভাই। উম্মুল হাকীম বিবাহের পর থেকে তার স্বামী ইকরিমার সাথে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় অত্যন্ত ভালোবাসার বন্ধনে কাটিয়েছেন। তাই তিনি চাইলেন জীবনের বাকী সময়টা তার সাথেই কাটাবেন। কিন্তু তিনি তো এখন মুসলিম এবং তার স্বামী ইকরিমা কাফির-বেদ্বীন। তার সাথে তো বৈবাহিক সম্পর্কই টিকছে না। কিভাবে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হবে? কিভাবে তিনি তাঁর স্বামীর ভালোবাসা ও আদর-যত্নের বন্ধনে থেকে জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু পার করবেন? যিনি তাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে এত ভালোবাসতেন, এখন থেকে কিভাবে তাকে ধরে রাখবেন এবং কিভাবে তাকেও আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন? তিনি যেমন তাওহীদের কালেমা পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর সান্নিধ্য পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছেন, তেমনি তার স্বামী ইকরিমাকে এ পথে কিভাবে আনা যায়, এমনি আরো অনেক ভাবনা হয়তবা তার মাথায় সেদিন ঘুরপাক খাচ্ছিল। ভেবে-চিন্তে এরই মধ্যে উম্মুল হাকীম নবী করীম (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে বলে ফেললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি ইকরিমাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারি এবং সে যদি আপনার সামনে এসে তাওহীদ ও রিসালাতের বাক্য পাঠ করে ইসলাম কবুল করে, তাহলে আপনি কি তাকে গ্রহণ করবেন? তাকে কি ক্ষমা করবেন? আপনি তাকে নিরাপত্তা দিবেন? রাসূল (ﷺ), অবশ্যই আমি তাকে নিরাপত্ত দিবো? রাসূল (ﷺ)-এর পবিত্র জবানীতে আশার বাণী শুনে আনন্দ ও খুশীতে উম্মুল হাকীমের চেহারাটা পূর্ণিমার চাদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বের হয়ে গেলেন ইকরিমার সন্ধানে, তাকে কল্যাণের পথে অনয়নের জন্যে। এ জন্য তাকে

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- বাং জ. আ. হা.।*

যত কষ্ট করা দরকার, তাই তিনি করবেন। বাধাবিপত্তি যতই আসুক, তিনি পিছপা হবেন না। কারণ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিরাট, এর বিনিময়ও পাওয়া যাবে প্রচুর। তাই তিনি তার ক্রীতদাসকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন মরুপথে ইয়ামানের দিকে। এই বিশ্বাসে যে, তার প্রিয় ইকরিমা এ পথেই পালিয়ে গেছে। তিনি জানতেন, সুবিশাল মরুপথ পাড়ি দেওয়া তার জন্য মোটেই সহজ নয়। কারণ, তিনি তো একজন মহিলা। মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে কোনো ভয়-ভীতিই তার যাত্রা পথে অন্তরায় হতে পারেনি। তিনি ছুটছেন মরুভূমি দিয়ে। যেখানেই পাবেন, সেখান থেকেই যে কোনো মূল্যে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবেন।

এর মধ্যে রাস্তায় তিনি একটি মহাবিপদের সম্মুখীন হলেন। তিনি অনুভব করলেন, তার ক্রীতদাস এই নির্জন মরুভূমির মধ্যে তার উপর কুদৃষ্টি দিচ্ছে এবং তার মনের কু-ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চাচ্ছে। উম্মুল হাকীম এটা বুঝতে পেরে ক্রীতদাসকে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নেই। উম্মুল হাকীম সুকৌশলে নিজেকে রক্ষা করছিলেন আর সামনের দিকে আগাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে একটি আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল! এই অপদার্থ-অদম আমার সাথে খিয়ানত করতে চাচ্ছে এবং আমার স্বামীর মান-সম্মান নষ্ট করতে চাচ্ছে। তোমরা একে বেঁধে রাখো। আমার স্বামীকে নিয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা একে ছাড়বে না। আরব গোত্রের লোকেরা তাকে বেধে রাখলো। এবার তিনি একাই ছুটছেন সামনের দিকে। যেতে যেতে লোহিত সাগরের কিনারায় যেখান দিয়ে লোকেরা নৌকাযোগে পার হয়, ঠিক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, একটি নৌকা কেবল ছেড়ে যাচ্ছে। তাতে তার স্বামী ইকিরমাকেও লোকদের সাথে দেখা যাচ্ছে। অতঃপর উম্মুল হাকীম চিৎকার করে বললেন, ওহে ইকরিমা! তুমি যেয়ো না, ফিরে এসো, আমি তোমার জন্য রাসূল (ﷺ)-এর কাছ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি। ইকরিমা তার স্ত্রী উম্মুল হাকীমকে দেখে অবাক হলো। উম্মুল হাকীম তার সন্ধানে এ পর্যন্ত এসে গেছে, এটা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না; কিন্তু বাস্তবতা তাকে মেনে নিতেই হলো। সে জিজ্ঞাসা করলো, আসলেই তুমি আমার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে এসেছো? উম্মুল হাকীম আবারো দৃঢ়তার সাথে বললো, আমি অবশ্যই তোমার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি। অতঃপর নৌকার লোকদেরকে বুঝিয়ে ইকরিমা নেমে তার স্ত্রীর সাথে মক্কার পথে রওয়ানা হলো। আসার পথে ক্রীতাদাসের সাথে যে ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে উম্মুল হাকীম প্রথমে ইকরিমাকে কিছুই বলেনি। অতঃপর যেই আরব গোত্রের নিকট ক্রীতদাসটি বাধা ছিল, সেখানে এসে ক্রীতদাসের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এই নিকৃষ্ট দাসটি তোমার সম্মান নষ্ট করতে চেয়েছিল। এটা শুনেই ইকরিমা তার তলোয়ারের এক আঘাতে ক্রীতদাসের মস্তক মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনরায় উভয়েই মক্কার পথে যাত্রা করলেন।

উম্মুল হাকীমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই উম্মতের আরেক ফেরাউন বলে পরিচিত ইকরিমা ইবনু আবূ জাহেল ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস এই যে, তার স্ত্রী উম্মুল হাকীম তার পলাতক স্বামী ইকরিমাকে নিরাপত্তা দিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি ফিরে এসে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে বসলেন এবং ইসলামের কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনে আন্তরিক হয়ে উঠেন। এরই মধ্যে মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা তার নিকট প্রিয়তম 'আমলে পরিণত হলো। তিনি মহান আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করার জন্য তাঁর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে ১৫ হিজরি সালে মুসলিম সেনাবাহিনী যখন সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে বের হলেন, তখন ইকরিমা ইবনু আবূ জাহেল সেই যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। আবূ উবাইদাহ্ ইবনু জাররাহ ছিলেন এই যুদ্ধের সেনাপতি। তাঁর নের্তৃত্বে মুসলিম বীর সেনানীরা এই যুদ্ধে রোমকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও অনেক মুসলিম বীর সৈনিক এতে শাহাদাত

বরণ করেন। তাদের মধ্যে উম্মুল হাকীমের ইকরিমা ছিলেন অন্যতম। ইকরিমার সাথে তার স্ত্রী উম্মুল হাকীমও এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে উম্মুল হাকীমের ভাই এবং তার সন্তানও শাহাদাত বরণ করেন। তাই তিনি স্বামী, সন্তান ও ভাই এই তিনজন আপন লোককে হারিয়ে তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি সবর ও ধৈর্যের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। অতঃপর চার মাস দশদিন ইদ্দত পার হওয়ার পর কোনো কোনো সাহাবী তার দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। যারা তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে খালিদ সা'ঈদ ইবনু 'আস অন্যতম। তিনি খালেদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। খালেদের সাথে বিবাহ সম্পন্ন হতে না হতেই যুদ্ধের ডাক চলে আসে। তার স্বামী খালেদ এবারের জিহাদে শরীক হওয়ার বাসনা প্রকাশ করায় তিনি তাকে বললেন, তুমি যদি কিছু সময় বিলম্ব করতে এবং মুসলিমদের হাতে রোমকদের শোচনীয় পরাজয়ের পর এবং মুসলিম বাহিনীর বিজয় হওয়ার পর আমার সাথে বাসর করতে! কিন্তু তার স্বামী খালেদ তাকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধেই আমি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবো। তাই তিনি সেখানে একটি পুলের নিকটস্থ তাবুতে তার সাথে বাসর করলেন। পরবর্তীতে সেই পুলটিকে উম্মুল হাকীমের নামে নামকরণ করে "কানতারাতু উম্মিল হাকীম" বলা হয়েছে। কানতারা মানে পুল। সিরিয়ার হুরান অঞ্চলে আজও এটি সেই নামে পরিচিত। বাসরের পর খালেদ সাহাবীদেরকে একটি ভোজনের প্রতি আহ্বান জানালেন। এরই মধ্যে রোমকরা যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হয়ে গেলো। তখন খালেদ উম্মুল হাকীমের কাছে বের হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর খালেদ যুদ্ধে বের হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। তার স্বামীর এই অবস্থা দেখে ঈমান ও ইখলাসের বলে বলিয়ান উম্মুল হাকীম সেদিন যেই তাবুতে তার স্বামীর সাতে বাসর করেছিলেন, তার খুঁটি উঠিয়ে তা নিয়ে এবং নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করে ময়দানের দিকে এগিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়তে লাগলেন। উম্মুল হাকীম সেদিন তার স্বামীর প্রতিশোধ নিতে এবং শাহাদাতের তামান্না নিয়ে যুদ্ধ করে সাতজন রোমক সেনাকে হত্যা করেছিলেন। বলা হয়েছে যে, যে কাফিরটি খালেদকে হত্যা করেছিল, সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে বলেছে, আমি যখন খালেদকে হত্যা করি, তখন দেখেছি একটি নূর তার থেকে বের হয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

এই মহিয়াসী মহিলার ত্যাগ, বীরত্ব ও কৃতিত্বের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। ইয়ারমুকের পরেও তিনি তার ঈমানী মিশন অব্যাহত রেখেছেন। দীর্ঘ জীবনের কঠিন কঠিন অবস্থা পার করেছেন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে। কোনো বিপদ-মসীবতই তাকে মোটে টলাতে পারেনি। প্রতিটি ঈমানী পরীক্ষাতেই মজবুত পাহাড়ের মতে টিকে থেকে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বারবার সম্মানিত করেছেন।

এই সম্মানিত মহিলার দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি এভাবে হয়েছিল যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁর বীরত্ব ও একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করেন। বিবাহের পর অল্পদিন তাঁর সাথে জীবন-যাপন করার সুযোগ হয়েছিল। অতঃপর ফাতিমাহ্ বিনতু 'উমারকে প্রসব করার পরপরই তার মৃত্যু হয়। এভাবেই শেষ হলো পরপর ইসলামের তিনজন শহীদ বীর সেনানীর সাথে উম্মুল হাকীমের কৃতিত্বময় সংগ্রামী জীবন।

ধন্য হয়েছেন ইকরিমা, ধন্য হয়েছেন খালেদ, ধন্য হয়েছেন 'উমার। তাদের সাথে সঙ্গ দিয়ে এবং তাদের স্ত্রীত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন উম্মুল হাকীম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেমন দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন, তেমনি আখিরাতেও সম্মানিত করবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস ও আকাঙ্খা। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি তাঁকে নবী, শহীদ, সিদ্দীক ও সালেহীনদের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। আমাদেরকেও তাদের সাথে শামিল করুন –আমীন। ☒

নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

নূহ্ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বর্তমান সময়ের ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চলে। এর আগে মানুষ কেবল কৃষিকাজ করত, সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু ওই সময় সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে শুরু করে এবং সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এক ভাগে ছিল অভিজাত শ্রেণি, অন্য ভাগে ছিল নিম্নশ্রেণি। অভিজাত শ্রেণির মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করত, তাদের নিচু চোখে দেখত। অভিজাতরা দেখতেই কেবল মানুষ ছিল, তাদের মাঝে মানুষের কোনো গুণ ছিল না। তাদের আচার-আচরণ ছিল জন্তু-জানোয়ারের মতো।[৫৩]

তারা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর নামে পাঁচটি মূর্তির পূজা করত। নূহ্ (আলাইহিস সালাম) কাউকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলে তাদের নেতৃবৃন্দ বলত, তোমরা মূর্তিদের ত্যাগ করো না। যারা তাদের কথা শুনত না তাদেরকে দিনের পর দিন শুধু অত্যাচার করতে থাকে। অভিজাত লোকেরা তাদের সন্তানদেরও শিখিয়ে দিত কীভাবে নবী ও মুসলিমদের প্রতি যুল্‌ম করতে হবে। নূহ্ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর কাছে বললেন,

﴿قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا﴾

“নূহ্ (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।”[৫৪]

এক পর্যায়ে আল্লাহ তা‘আলা ওয়াহী মারফত জানালেন,

﴿وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ﴾

“নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, ‘যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না’। সুতরাং তারা যা করে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না।”[৫৫]

নূহ্ (আলাইহিস সালাম) তখন কাতরকণ্ঠে ফরিয়াদ করলেন,

﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ﴾

“নূহ্ বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে’।”[৫৬]

একদম শেষে তিনি বদদু‘আ করেন,

﴿وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾

“নূহ (আলাইহিস সালাম) আরো বলেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে ছেড়ে দিবেন না। আপনি যদি তাদেরকে ছেড়ে দেন তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্তকরবে এবং যারা জন্ম লাভ করবে তারা হবে দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।”[৫৭]

এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে একটি বিশাল নৌকা তৈরি করতে বলেন। কীভাবে নৌকা বানাতে হবে আল্লাহ তা‘আলাই শিখিয়ে দেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘নৌকাটি লম্বায় ছিল ১২০০ হাত, আর পাশ ছিল ৬০০ হাত।’ উচ্চতা ছিল ৩০ হাত, তিনতলা ছিল নিচতলায় কীট-পতঙ্গ ও জন্তু-জানোয়ার, দোতলায় মানুষ আর তৃতীয় তলায় থাকবে পাখ-পাখালি।[৫৮]

পবিত্র আল কুরআনে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবনের ঘটনাটি আল্লাহ তা‘আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۭ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ○ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۭ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ○ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا

---

[৫৩] *তাবিলুল আহাদীস- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, ১৮ পৃ.।*
[৫৪] *সূরা নূহ: ২১।*
[৫৫] *সূরা হূদ: ৩৬।*
[৫৬] *সূরা আল মু'মিনুন: ২৬।*
[৫৭] *সূরা নূহ: ২৬-২৭।*
[৫৮] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/২৫৮, বাং ই. ফা.।*

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○ وَهِیَ
تَجْرِیْ بِهِمْ فِیْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۟ وَنَادٰی نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِیْ
مَعْزِلٍ یّٰبُنَیَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِیْنَ ○ قَالَ سَاٰوِیْۤ
اِلٰی جَبَلٍ یَّعْصِمُنِیْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ
اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِیْنَ ○
وَقِیْلَ یٰۤاَرْضُ ابْلَعِیْ مَآءَكِ وَیٰسَمَآءُ اَقْلِعِیْ وَغِیْضَ الْمَآءُ وَقُضِیَ
الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُوْدِیِّ وَقِیْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ○
وَنَادٰی نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِیْنَ ○ قَالَ یٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ
عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ٭ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّیْۤ اَعِظُكَ
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِیْنَ ○ قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا
لَیْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ
○ قِیْلَ یٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَیْكَ وَعَلٰۤی اُمَمٍ مِّمَّنْ
مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۞

“তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তারা তো নিমজ্জিত হবে। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার নিকট দিয়ে যেত, তাকে উপহাস করত; সে বলত, ‘তোমরা যদি আমাকে উপহাস করো তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কার উপর পতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। অবশেষে যখন আমার আদেশ আসলো এবং উনান উথলিয়ে উঠল; আমি বললাম, ‘এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণির যুগলের দু’টি, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে।’ তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল অল্প কয়েকজন। সে বলল, ‘এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামে এটার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে বেয়ে চলল; নূহ্ তার পুত্রকে, যে পৃথক ছিল, আহ্বান করে বলল, ‘হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সঙ্গী হইও না। সে বলল, ‘আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিব যা আমাকে প্লাবন হতে রক্ষা করবে।’ সে বলল, ‘আজ আল্লাহর হুকুম হতে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ব্যতীত। এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। এরপর বলা হলো– ‘হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।’ এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক। নূহ্ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বললেন, ‘হে নূহ্! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও। সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আপনার কাছে চাওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। বলা হলো– ‘হে নূহ্! অবতরণ করো আমার পক্ষ হতে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি; অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করতে দিব, পরে আমার হতে মর্মান্তিক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।”[৫৯]

নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর প্লাবন ও বুড়ির ঘটনা

নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর প্লাবন কেন্দ্রিক একটি ঘটনা সমাজে প্রচলিত আছে। নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর প্লাবনের পূর্বক্ষণে এক বুড়ি নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-কে বলল, নূহ্ (আলায়হিস সালাম)! প্লাবনের পূর্বে আমাকে তোমার কিশতিতে নিয়ে যেও। কিন্তু নূহ্ (আলায়হিস সালাম) ঐ মুহূর্তে বুড়ির কথা ভুলে যান। আর আল্লাহর মহিমায় বুড়ি প্লাবন টেরই পায় না। প্লাবন শেষে নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে দেখা হলে বুড়ি বলল, নূহ্! কী ব্যাপার তোমার প্লাবন কবে আসবে? এবার নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর মনে পড়ে গেল, বুড়ি তাকে নিয়ে যেতে বলেছিল, কিন্তু সে সময় বুড়ির কথা তার মনেই ছিল না। তখন নূহ্ (আলায়হিস সালাম) তাকে বলেন, প্লাবন তো হয়ে গেছে। তখন বুড়ি বলল, কবে প্লাবন হলো, আমি তো কিছু টেরই পেলাম না! নূহ্ (আলায়হিস সালাম) বললেন, আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়েছেন। *[এ ঘটনাটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন]*

---

[৫৯] *সূরা হূদ: ৩৭-৪৮।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় খতমে ইউনুস পাঠ

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক: যে কোনো বালা-মুসিবত, বিপদাপদ, দুঃশ্চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ইত্যাদি থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে দু‘আ ইউনুস পাঠ করা অত্যন্ত কার্যকর ‘আমল। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। এটি পড়ার পর একান্ত বিনয়-নম্রতা, পূর্ণ আন্তরিকতা ও ভয়ভীতি সহকারে মহান আল্লাহর নিকট দু‘আ করতে হয়। আমির সানআনী বলেন,

فإن قيل: هذا ذكر لا دعاء! قلنا: هو ذكر يفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء. ("انتهى من " التنوير)

“যদি বলা হয়, এটা তো একটা যিক্‌র; দু‘আ নয়। আমরা বলব, এটি এমন একটি যিক্‌র যা দ্বারা দু‘আ শুরু করা হয়। এটা পড়ার পর যা ইচ্ছা দু‘আ করবে।”[৬০]

এভাবে প্রথমে দু‘আ ইউনুস পাঠ করার পর দু‘আ করলে আশা করা যায়, মহান দয়ালু দাতা আল্লাহ দু‘আ কবুল করবেন। তবে শর্ত হলো– দু‘আ কবুলের শর্তাবলী ও আদব ঠিক থাকতে হবে। যেমন-

◈ হালাল উপার্জন থেকে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা এবং হালাল অর্থের উপর জীবন-যাপন করা। ◈ দু‘আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা। দু‘আ শেষে আবারও দরুদ পাঠ করা ভালো। ◈ দু‘আ কবুল হওয়ার দৃঢ় আস্থা ও মনোভাব সহকারে দু‘আ করা। ◈ একান্ত বিনয়-নম্রতার সাথে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে এক দু‘আ বারবার করা। ◈ দু‘আ করতে করতে বিরক্ত না হওয়া। ◈ দু‘আ কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা। ◈ দু‘আর মধ্যে গুনাহের কিছু না থাকা ইত্যাদি।

আরও মনে রাখতে হবে, যে কোনো দু‘আ আল্লাহ তিনভাবে কবুল করেন –যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। যথা-

১) আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে কখনো তার প্রত্যাশিত চাওয়াটি দুনিয়াতেই পূরণ করেন।

২) কখনো তিনি এর প্রতিদান আখিরাতের জন্য জমা রাখেন। তিনি বান্দার দুনিয়াবি প্রত্যাশা পূরণ না করে এই দু‘আর বিনিময়ে আখিরাতে তাকে মহা পুরষ্কারে ভূষিত করবেন –যা তার জন্য দুনিয়া থেকে আরও বেশি কল্যাণকর।

৩) কখনো এই দু‘আর কারণে তাকে বড়ো ধরণের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন –যার তার জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিল।

খতমে ইউনুস একটি বিদআতী ‘আমল: বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ লাভ, রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ, মৃতপ্রায় ব্যক্তির সহজে জান কবজ, মৃত ব্যক্তির গোর আজাব মাফ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে হাফেয, ইমাম ও মৌলভীদেরকে টাকার মাধ্যমে ভাড়া করে অথবা সাধারণ লোকজন জমা‘আত করে তসবিদানা, ডিজিটাল কাউন্টার মেশিন, তেঁতুলের বিচি, পাথরের টুকরা, কঙ্কর ইত্যাদি দ্বারা সত্তর হাজার বার অথবা সোয়া লক্ষ বার বা ৩১৩ বা এ জাতীয় নির্দিষ্ট সংখ্যায় পাঠ করার মাধ্যমে ‘খতমে ইউনুস’ বা ‘দু‘আ ইউনুসের খতম’ করার প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও শরী‘আত বহির্ভূত বিদআত। এ ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং এগুলো তথাকথিত বুর্জগদের পক্ষ থেকে দীনের মধ্যে নতুন সংযোজন (বিদআত) যা ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্টতম কাজ হলো, দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা (বিদআত তৈরি করা) –শরী‘আতের দৃষ্টিতে যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন- হাদীসে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. وَفِيْ نَسَائِيْ (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ).

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) হামদ ও সালাতের পর বলেন, ‘নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ হিদায়াত (পথনির্দেশ) হলো মুহাম্মদের হিদায়াত (পথনির্দেশ)।

[পরবর্তী অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৬০] *আত্ তানবীর- ৬/৯৮।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অন্যায়কে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে

–মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম*

অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে যায়। শিক্ষানীতি অথবা শিক্ষা প্রজ্ঞাপনে যাই লেখা থাকুক না কেন, তার তোয়াক্কা না করে অনেক প্রধান, সহকারী প্রধান, প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল নিয়োগ হয়ে গেছেন। কয়েক বছর ধরে অনেক প্রধান সহকারী প্রধানকে নির্দ্বিধায় বহিষ্কার করা হয়েছে, প্রতিবাদ করার কোনো লোক পাওয়া যায়নি, প্রতিবাদ করার কেউ সাহসও পায়নি। আজ সেই অন্যায় ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে বিকট আকার ধারণ করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের ইসলামীয়া ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, জনাব সিদ্দিক হোসাইনকে চাকরি থাকাকালীন, চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো, নিজেও প্রতিবাদ করতে পারলেন না, প্রতিবাদ করার মতো একটা সদস্যও পাওয়া গেল না। রাজশাহীর আরেকটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদ মিশন স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সিরাজুল ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া হলো, সেদিনও কোনো প্রতিবাদ করার একজন প্রিন্সিপাল বা শিক্ষকও পাওয়া যায়নি। তেজগাঁ কলেজের প্রিন্সিপালকে সরিয়ে দেওয়া হলো চাকরি থাকাকালীন। সিনিয়র অনেক টিচার থাকার পরেও নিচ থেকে একজনকে টেনে নিয়ে এসে তাকে প্রিন্সিপাল করানো হলো, সেদিন আইন নীতিমালা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কোথায় ছিল?

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ডক্টর এরশাদুল বারীকে বহিষ্কার করা হলো, কি ছিল তার অপরাধ? সরিষাবাড়ী আরাম নগর আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল আব্দুল জলিলকে চাকরি থাকাকালীনই তাকে মাদ্‌রাসায় আসতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। বেঁচে থাকাকালীন আর কোনোদিন মাদ্‌রাসায় আসেননি। দেশের সেরা মাদ্‌রাসা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল জয়নাল আবদীনকে পিটমোড়া দিয়ে বেঁধে যখন ক্যাম্পাস থেকে বের করে নেয়া হলো এদেশের আলেম সমাজ বা প্রিন্সিপালেরা কোথায় ছিলেন, একটি প্রতিবাদও করেননি? ধীরে ধীরে সে অন্যায়গুলো বিরাট আকার ধারণ করে আজ প্রধান, সহকারী প্রধান, প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপালদের ওপর একটি অন্যায়ের ঝড়হাওয়া হয়ে আঘাত হানছে, এই ঝড় যদি অংকুরে বিনষ্ট করা যেত তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়তো হতো না। কোথায় ছিল সেদিন জমিয়তুল মুদার্রেছীন বা অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনগুলো? মাধ্যমিক স্কুল এবং দাখিল মাদ্‌রাসায়, প্রধান, সহকারী প্রধান নিয়োগ হতে হলে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা পূর্বে থেকেই প্রজ্ঞাপনে লেখা আছে, একদিনও অভিজ্ঞতা নেই বা অভিজ্ঞতা হয়নি, এমন প্রধান, সহকারী প্রধান নিয়োগ হয়েছে অনেক। তবুও তাদের বেতন হয়েছে, তবুও তাদের বিল হয়েছে, চাকরিও যথারীতি টিকে গেছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল না থাকলে, সিনিওরিটিরভিত্তিতে যিনি দায়িত্ব পেয়ে থাকেন প্রজ্ঞাপনের নিয়ম অনুযায়ী, তাকে পাশ কাটিয়ে জুনিয়র একজনকে দায়িত্ব দিয়ে অনেক নিয়োগও হয়ে গেছে অথবা তিনি নিজেই চেয়ারে বসে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। নিজে নিয়োগ নেওয়ার সময় নামমাত্র কাউকে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দিয়ে নিজেই ভাইবা বোর্ড গঠন করে এক্সপার্ট নিয়ে এসে নিজেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন এমনতো নজির অনেক। যোগ্য, অভিজ্ঞ, দক্ষ, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চতর ডিগ্রীধারী, অত্যন্ত ভালো ফলাফলের অধিকারী প্রার্থীকে ভাইবা রিটেনের নাম্বার কমিয়ে তাকে তৃতীয়, চতুর্থ করা হয়েছে, যাতে তিনি ঐ পদে আসতে না পারেন এমন নজিরও অনেক রয়েছে। বাংলাদেশের ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অথবা তার প্রতিনিধিগণের যে কেউ। সেই সকল ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালগণ, যেনতেনকে সভাপতি করে, যার স্বাক্ষর করতে কলম বেঁকে যায়, অর্থাৎ- আলিম মাদ্‌রাসার সভাপতি হয়েছেন অষ্টম শ্রেণি পাস। শিক্ষক নিয়োগের রেজুলেশন হয়ে যায় যা তিনি বুঝতেই পারেন না, ভাইবা বোর্ড গঠন করতে হয়, প্রিন্সিপাল সাব করেন তাও তিনি বুঝতে পারেন না। প্রিন্সিপাল সাহেবের নিজের আত্মীয়-স্বজন আপনজন ওই পদে ঢুকানোর জন্য গোপনে ভাইবাবোর্ড গঠন করে আড়াল জায়গাতে ইন্টারভিউ হয়ে যায় শিক্ষকরা কেউ জানতেই পারেন না। এক সময় যোগদান করে প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী। তখন সকলেই

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মুহাম্মাদীয়া, বল্লা, ফাজিল মাদ্‌রাসা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।*

বুঝতে পারেন যে তার স্ত্রী নিয়োগ হয়ে গেছে। তাই প্রিন্সিপাল সাহেবরাও দুধে ধোয়া তুলসী পাতা নয়। যাই আর একটু পিছন দিকের কথা ১৯৮৮ সালের পর একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম ঢাকার একটি মাদ্‌রাসায়। সেই চাকরিটাও আমার হওয়ার কথা ছিল কারণ ইন্টারভিউ বেশ ভালোই হয়েছিল। পরে জানতে পারলাম প্রিন্সিপাল সাহেবের ভাই যিনি দরখাস্ত করেননি ইন্টারভিউ বোর্ডেও হাজির হননি, পরবর্তীতে দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ বোর্ডে হাজির হয়েছে এমন রেজুলেশন দেখিয়ে বেতন করে দিয়েছেন। সেও ২৫বছর চাকরি করে অবসরে গিয়েছেন। এইতো এক সময় ছিল প্রধান বা প্রিন্সিপালদের কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ। আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলেন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন। তারা প্রজ্ঞাপনের এই বিষয়টি হয়তো ভালো করে অনেকেই জানেন না। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যে চরম বৈষম্য রয়েছে। হাজার হাজার প্রাইমারি সরকারি হলেও এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা একটিও সরকারি হয়নি। শত শত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি হলেও একটি দাখিল মাদ্‌রাসা ও সরকারি হয়নি। শত শত কলেজ সরকারি হলেও আলেম ফাজিল কামিল মাদ্‌রাসা সরকারি হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে একটি মাদ্‌রাসা সরকারি হয়েছিল ঢাকা মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া। এরশাদ আমলের দু'টি মাদ্‌রাসা সরকারি হয়েছিল একটি সিলেটে এবং একটি বগুড়ায়। তাতে সরকারি মাদ্‌রাসার সংখ্যা তিনটি। উত্তরবঙ্গে একটি কামিল মাদ্‌রাসা সরকারি হয়েছে বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি এখনো বিল হয়েছে কিনা জানা নেই। দাখিল মাদ্‌রাসায় সুপার এবং সহ-সুপার আলিম ফাজিল কামিল মাদ্‌রাসায় প্রিন্সিপাল এবং ভাইস প্রিন্সিপাল হতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধুমাত্র কামিল পাস এবং আরবি প্রভাষক/এবং সহকারী অধ্যাপক হলে তিনিই শুধুমাত্র দরখাস্ত করতে পারবেন আর কেউ নয়, তিনি যদি অন্য সাবজেক্টের প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপক হয়ে থাকেন তাহলে এ পদে আসা তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম। অন্য কোনো বিষয়ের প্রভাষক বা সহকারী অধ্যপক তিনি যদি কামেল পাসও হন তবুও তিনি দরখাস্ত করতে পারবেন না, এমনভাবে একটি বেইনসাফি আইন বানিয়ে বা তৈরি করে নেওয়া হয়েছে, এটা একটি চরম বৈষম্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ প্রশাসনিক ভাষা ইংরেজি এবং বাংলা। একবার প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হলো– যে কোনো বিষয়ের প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপকগণ প্রিন্সিপাল হতে কোনো বাধা নেই। সে সময় বাংলাদেশের মাদ্‌রাসাসমূহে ৫১জন জেনারেল শিক্ষিত প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপকগণ প্রিন্সিপাল হয়ে গিয়েছেন অলরেডি। সাথে সাথে মাদ্‌রাসা শিক্ষক সমিতি জমিয়তুল মুদার্রেসীন, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, তাদের পক্ষে রায়টি বাগিয়ে নেন। এটা কি বৈষম্য নয়, নিশ্চয়ই এটা চরম বৈষম্য। কারণ আরবিতে বা ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স মাস্টার্স করা, কলেজে প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল হতে কোনো বাধা নেই। তাহলে মাদ্‌রাসায় শুধুমাত্র তাদেরই সুযোগ দিয়ে অন্যদেরকে চরম বৈষম্যের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিত। আরবি শিক্ষিত শিক্ষকদের প্রধান, সহকারী প্রধান হতে গেলে একটি জেনারেল ডিগ্রী প্রয়োজন ছিল, সেটিও তুলে দেওয়া হয়েছে সেই অনেক আগেই। এটা কি বৈষম্য নয়? আশা করি এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে। আরবি শিক্ষিত সহকারি শিক্ষক সহকারী প্রধান স্কুলে, প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল কলেজে হতে পারে, তাহলে জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি আরবি ও জানেন তবুও তাদের কেন প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপাল সুপার সহ-সুপার করা হয় না এটা আমার বোধগম্য নয়। শিক্ষানীতির সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের কাছে আমাদের আবেদন নিবেদন অবিলম্বে এই ধরনের নীতিমালা সংস্কার করার। বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্‌রাসায় চলমান প্রধানদের যে দুরবস্থা, বা জটিলতা দেখা যাচ্ছে, তার অন্যতম কারণ, অভিজ্ঞ যোগ্যদেরকে দূরে ঠেলে দিয়ে টাকা-পয়সা খরচ করে, কমিটির সদস্য বা সভাপতির যোগসাজশে উৎকোচ দিয়ে যারা এসেছেন বেশিরভাগই তাদের উপর আজ এমন হেনস্ত, অপমান বেইজ্জতিরসম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইহা হলো দীর্ঘদিনের জমানো রাগ-গোস্যা প্রতিবাদ প্রতিরোধের ঝড়। অন্যদিকে শিক্ষানীতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে, সে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে চায় না। যোগ্য শিক্ষকের অভাবে নম্র ভদ্র শিক্ষার্থী যেমন তৈরি হচ্ছে না, তদ্রূপ শিক্ষকরাও তাদের কাছ থেকে সেই সম্মান পাচ্ছে না, এ সমস্যা ও খুব শীঘ্রই দূর হওয়া উচিত। সুস্থ সুন্দর শিক্ষানীতির মাধ্যমে, আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরি করতে পারলে শিক্ষকরা তাদের কাছ থেকে সম্মান পাবে। শিক্ষক যদি আদর্শ না হয় আদর্শ শিক্ষার্থী ও তৈরি হবে না। সুন্দর শিক্ষানীতি, যোগ্য আদর্শ শিক্ষকই তৈরি করতে পারে, নীতিবান শিক্ষার্থী, তবে শিক্ষকরা তাদের কাছ থেকে পেতে পারে সম্মান। আর চলমান সময়ে বদলি ব্যবস্থা খুবই জরুরি, তাহলে চাকরিও বাঁচবে সম্মানও রক্ষা পাবে। বদলির মাধ্যমে চলমান সংকটের উত্তরণ হতে পারে। ☒

নিভৃত ভাবনা

শিক্ষার্থীর আশার আলো শিক্ষক

–মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)*

শিক্ষক মানে কী?

ছাত্র জীবনে আমরা অধিকাংশরাই বুঝতে পারি না শিক্ষকের গুরুত্ব। কিন্তু জীবনযুদ্ধে যখন কর্মজীবনে আমরা প্রবেশ করি, তখন বুঝি আমাদের অলক্ষ্যে কোনো শক্তিকে আমাদের মধ্যে সফলভাবে পুড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষকরা।

তবে অল্প সময়ের শিক্ষকতা জীবনে শিখতে পারিনি কিছুই, কিন্তু বাস্তবতা দেখেছি অনেক কিছু। আমার প্রভাবে কারো আচরণের পরিবর্তন হয়নি হয়তো বা! কিন্তু যেটা সত্য ও ন্যায় বলার চেষ্টা করছি। কাউকে ভালোবাসতে পারিনি হয়তো তাদের মতো করে! কিন্তু সবার অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছি যার জন্য আমি চির ঋণী থাকব সকলের কাছে।

তাই তো সব সময় আমি ভাবি, আমি কি সত্যিকারের শিক্ষক হতে পেরেছি! সত্যিকারের শিক্ষক তো তিনিই, যিনি আমাদের ভাবতে, চলতে, চিন্তা করতে এবং একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সর্বদা সাহায্য করেন।

আমি আমার জীবনে চলার পথে বহু শিক্ষকের সংস্পর্শ পেয়েছি। যাদের মধ্যে কয়েকজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। তাদের আমি সারা জীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। যাদের ছাড়া আজ আমি শিক্ষক হিসেবে নিজেকে পরিচয় করাতে পারি না। তাদের অবদান আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন শ্রদ্ধার সাথে সাথে স্মরণ করে যাব। ধন্যবাদ, আমার সেই সকল ওস্তাদ ও গুরুদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমি আজকের শাওন স্যার।

শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো ছাত্রদের সাথে এমনভাবে মেশা যেভাবে একজন ছাত্র তার শিক্ষককে পরম আপনজন ভাবতে বাধ্য থাকে। সে যেকোনো বিষয়ে আনন্দ পেতে পারে, একজন পরম আস্তাভাজন ব্যক্তি হিসেবে পাশে পেতে পারে। শিক্ষক শুধুই শিক্ষা প্রদান করেন এমনটা কিন্তু না! সে ভবিষ্যৎ জাতির উজ্জ্বল শিখাটাকে প্রস্তুত করেন। যে তার আলোতে পুরো বিশ্বটাকে আলোকিত করেন। তিনি সব সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে আশার আলো হিসেবে জেগে থাকেন।

তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষকদের মর্যাদার কথা বললেও বাস্তবের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে যেকোনো মূর্খ নেতার মর্যাদা বেশি। শিক্ষার্থীরা এগুলো দেখে এবং তা থেকে শিক্ষা নেয়। বেতনের জন্য শিক্ষকদের দিনের পর দিন রাজপথে শুয়ে থাকতে হয়। তবুও রাষ্ট্র নিরুপায় হয়ে দেখেই যায়। এই সভ্য সামাজে শিক্ষকের অধিকারের জন্য অনেক সময় লাঞ্ছিত হতে হয়। এক্ষেত্রে মুষ্টি কয়েক যোগ্য শিক্ষকদের সত্যের পথে লড়াকু সৈনিকের মত লড়াই চালিয়ে যেতে হয় বাধ্য হয়ে। এগুলোর শেষ কোথায়? জাতির কাছে প্রশ্ন? এখন সময় এসেছে এগুলোর উত্তরের যথার্থ সমাধান হওয়ার।

সর্বশেষে বলতে চাই, "Young Teacher: The Future of the profession." অর্থাৎ- তরুণ শিক্ষক, দেশের ভবিষ্যৎ। সরকারের দায়িত্ব শিক্ষকতায় নতুনদের আগমন এবং তাদের জন্য ক্যারিয়ারের পথ তৈরি করা। এই পথ সহজ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত করতে মেধাবি, সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের জায়গা সৃষ্টি করতে পারলেই জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। জাতির কাণ্ডারী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বইঘর, এমন শিক্ষক খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার, আপনার ও সকলের। ☒

* *লেখক ও কলামিস্ট; শিক্ষক, মিল্লাত উচ্চ বিদ্যালয়, বংশাল, ঢাকা।*

নারীদের ‘ইল্‌মী নববী চর্চা

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা

পশ্চিমা বিশ্বসহ তথাকথিত সুশীল সমাজ, নাদান মূর্খ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিতরা জাতিকে দিবালোকের ন্যায় চির সত্য বিষয়– নারীদের ‘ইল্‌মী নববী কিংবা নারীদের জ্ঞান চর্চায়’ পদচারণা কে ভুলিয়ে রাখার জন্য এর উপরে যত মিথ্যাচার, ইতিহাস বিকৃতি করা, বিভিন্ন অভিযোগ পেশ করে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে দাবি করতে চায় ইসলাম নারীদের জ্ঞান চর্চায় পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। তারা বলে– ইসলাম নারীদের সেকেলে স্টাইলে জীবনযাপন করতে বলে। তারা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে জ্ঞান সাধনা করতে পারবে না; বরং তারা জ্ঞান চর্চা বিমুখ আগামীর জাতি গঠন করবে। গোটা পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের অনুসারীরা এই মিথ্যাচারের প্রতিনিধিত্ব করছে সেইসাথে জাতির সাথে সবচেয়ে বড় প্রতারণা করছে। অথচ সামগ্রিক অর্থে বিবেচনা করলে দেখা যায় ইসলাম পরবর্তী সময়ে নারীদের জ্ঞান চর্চা এবং পুরুষের সাথে জ্ঞান চর্চা ছাড়াও মানবতার কল্যাণে যুগের ধারাবাহিকতায় সমান অবদান রেখেছে। নারীর অবদান বিহীন সমাজ কোনো যুগেই গড়ে ওঠেনি আর ওঠবেও না। কেননা উভয় উভয়ের সহযোগী এবং উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। বক্ষমান প্রবন্ধে “নারীদের ‘ইল্‌মী নববী চর্চা” শীর্ষক আলোচনায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে নারীদের ‘ইল্‌ম চর্চায় দূর্বার আগ্রহ এবং পুরুষের সাথে সমান প্রতিযোগিতা বজায় রেখে জ্ঞান সাধনায় সম্মুখ পানে চলার দলিল নির্ভর বলিষ্ঠ কিছু দিক পেশ করা হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

নারীদের ‘ইল্‌মী নববী চর্চা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম নবী (ﷺ)-এর জীবনসঙ্গী মা ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র কথা বলা আবশ্যক। তিনি সবচেয়ে কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও ‘ইল্‌মে নববী তথা হাদীস শাস্ত্রে কিংবদন্তির অবস্থান দখল করেন। তাঁর ‘ইল্‌মের গভীরতা এবং এতই বেশি পারদর্শিতা ছিল যার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন তাঁর কাছে আসত ‘ইল্‌ম অনুসন্ধানে। মহিলারা তাঁর কাছে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ফাতাওয়া নিতেন। আর তিনি স্বয়ং ফাতাওয়া নিতেন নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছ থেকে। ‘ইল্‌মে নববী চর্চা, তাঁর বাস্তব রুপ ছড়িয়ে দেয়া এবং নারীদের জ্ঞান নির্ভর একটি শিক্ষিত সমাজ গঠনে আল্লাহর নবী রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর স্ত্রীদের মাধ্যমেই জাতীর নারী সম্প্রদায় ‘ইল্‌ম সাধনার নব দ্বার উন্মোচন করে এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের সবক গ্রহণ করে অনাগত ভবিষ্যতের পথে পথ চলা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে জাতির সন্তানেরা উপহার পায় কিংবদন্তি সাহাবী, তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাস্‌সির। দেখুন: রাসূল (ﷺ)-এর কাছে স্বয়ং নারীগণ অভিযোগ পেশ করে বলেন,

পুরুষেরা আপনার কাছ থেকে হাদীস নিয়ে চলে গেল! অতএব আপনি আমাদের জন্য একদিন নির্ধারণ করে দিন (যাতে করে আমরা ইলমে শরীক হতে পারি)। নবী (ﷺ) তাঁদের উদ্দেশ্য বললেন: তোমরা অমুক অমুক দিন সকলে একত্রিত হও। অতঃপর তারা সকলেই একত্রিত হলো। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করলেন এবং বিভিন্ন কিছু আদেশ করেন।[৬১]

লক্ষ্য করুন! নবী (ﷺ)-এর যুগে মহিলারা জ্ঞান অর্জনের জন্য কিভাবে নিজেদের আগ্রহকে প্রকাশ করেছেন। এমনকি ভাষা দেখুন– পুরুষেরা আপনার কাছ থেকে হাদীস নিয়ে চলে গেল! জি এভাবেই নিজেদের প্রাপ্য হক্ব আদায় করতে হয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেকে এভাবেই প্রস্তুত করতে হয়। পিছে থাকা নয়; বরং জ্ঞান অর্জনের জন্য সদা জাগ্রত থাকতে হয়। যেটা সেই সময়ের নারীদের মধ্যে ছিল। এজন্য প্রচুর স্পীট লাগবে।

রাসূল (ﷺ) নারীদের ‘ইল্‌মী নববী চর্চা এবং তা আত্মস্থ করার জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে তাঁদের দিকে মনোযোগী ছিলেন। যাতে করে তাঁরা ‘ইল্‌মে নববী’র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে; বরং পুরুষের সাথে সমান তালে ‘ইল্‌ম অর্জনে ব্রুতী হয় সেটা খুবই

* *শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।*

[৬১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩১০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৩৩।*

গুরুত্ব দিয়েছেন। দেখুন: নবী (ﷺ)-এর ঈদের দিনের খুতবার পরের দৃশ্য–

তিনি পুরুষদের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় বক্তব্য পেশ করার পর স্থানান্তর হয়ে নারীদের উদ্দেশ্যে সারগর্ভ নসিহত করেছেন। নারীরা তো উপস্থিত ছিলেন-ই উপরন্তু যে সকল নারী মাসিক সমস্যায় জর্জরিত তাঁদেরকেও এই 'ইল্‌মী নববীর গুরুত্বপূর্ণ নসীহত থেকে মাহরুম না করার লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সেই সময়ের নারীরা 'ইল্‌মে অনেক পরিপক্কতা অর্জন করে। 'ইবাদত, 'আমল, আখলাক, ব্যবসা, বাণিজ্যসহ সকল প্রকার বৈধ কাজে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সমান দক্ষতা ও ভূমিকা পালন করে। স্মরণ করুণ! সেদিনের ঘটনা। যেদিন নবী (ﷺ)-এর পরিবারের কাছে আসে তিনজন ব্যক্তি। কারণ কি? কারণ হলো– তাঁরা নবী (ﷺ)-এর 'ইবাদত সম্পর্কে জানতে চায়।[৬২]

ঘটনা প্রবাহ লম্বা। সেটা উপস্থাপন করা আমার মূল লক্ষ্য নয়; বরং লক্ষণীয় হলো যে, তাঁরা আগমন করেছে রাসূলের স্ত্রীদের কাছে নবীর 'ইবাদতের জ্ঞান তথা 'ইল্‌মী নববী জানার জন্য। এখানে স্বয়ং পুরুষ মুখাপেক্ষী ছিল নারীদের কাছে 'ইল্‌ম অনুসন্ধানে, জানার গভীরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। তাহলে কিভাবে আপনি নারীদের 'ইল্‌ম চর্চাকে খাটো করে দেখবেন কিংবা নারীদের 'ইল্‌ম চর্চাকে পিছিয়ে রাখবেন?

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

"আল্লাহ তা'আলা লানত করেন এমন সব নারীর ওপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা (ভ্রুরু বা কপাল) চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং তারা সৌন্দর্য্যের জন্য দাঁত সরু ও তার ফাঁক বড় করে মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। এ সময় জনৈকা মহিলা ইবনু মাস'ঊদ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম, আপনি না-কি এমন এমন নারীদের ওপর লানত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের ওপর লানত করব না, যাদের ওপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন আর মহান আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। মহিলাটি বলল, আমি তো সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তো তা পেলাম না, যা আপনি বলছেন। তখন ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: যদি তুমি কুরআন পড়তে, তাহলে তুমি অবশ্যই (মনোযোগ দিয়ে) তা পেতে। আচ্ছা তুমি কি এ আয়াত পড়নি?

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

অর্থাৎ- 'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা মেনে নাও, আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো।'

এটা শুনে মহিলাটি বলল: হ্যাঁ, এটা তো পড়েছি। তখন ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহর রাসূল এ সমস্ত কাজ হতেও নিষেধ করেছেন।"[৬৩]

এই হাদীসটি ভালো করে লক্ষ্য করুন! দেখুন সাহাবী যুগে একজন নারীর কিতাবের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য। কিভাবে ঐ মহিলা জোর গলায় বলল– আমি গোটা কুরআন পড়েছি অথচ কোথাও পাইনি এমন কথা! নিঃসন্দেহে এই সকল হাদীস নারীর 'ইল্‌ম চর্চা, জানার কৌতুহল, 'ইল্‌ম অনুসন্ধানে কতটা উদগ্রীব ছিল। আরেকটি চিত্র দেখুন–

সুমামা ইবনু হাযন আল কুশাইরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি নবীজী (ﷺ) সম্পর্কে? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একজন হাবশী মেয়েকে ডাকল। অতঃপর তিনি তাঁকে (সুমামা) বলল, একে জিজ্ঞেস করো। কেননা সে আল্লাহর রাসূলের নাবীজ তৈরি করে দেয়।[৬৪]

এই ঘটনাও প্রমাণ করছে স্বয়ং পুরুষ ক্ষেত্র বিশেষে নারীর কাছে 'ইল্‌ম অনুসন্ধানে বাধ্য এবং উভয়েই উভয়ের জ্ঞান সমৃদ্ধির জন্য সমান প্রতিযোগিতা কাম্য।

উম্মু ফজল বিনতু হারেস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষেরা রাসূলের আরাফার রোযার ব্যাপারে পরস্পর বিতর্ক ও মতানৈক্যে লিপ্ত হলো। তাঁদের একদল বলছে, রাসূল (ﷺ) রোযা ছিলেন। আরেকদল বলছে– তিনি রোযা ছিলেন না। অতঃপর তাঁর কাছে একটি দুধের পাত্র পাঠানো হলো। এমতাবস্থায় তিনি উটের পিঠে অবস্থান

[৬২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৩৪৬৯।*

[৬৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৮৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২১২৫।*

[৬৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৪৩৯।*

করছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ অবস্থায় দুধ পান করলেন।[৬৫]

এই প্রেক্ষাপটের চিত্র ছিল অন্য ঘটনা থেকে একেবারেই ভিন্ন। মানুষের মাঝে বিবাদমান বিতর্ক ও মতানৈক্যে! সেই সময়ে একজন নারী যিনি হলেন উম্মু ফজল সমাধান দানকারী। এমন একটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতেও একজন নারীর 'ইল্‌মী নববী চর্চার দক্ষতা ও প্রকাশ সত্যি নারীর সম্মান, মর্যাদা ও জ্ঞান অর্জনের পথকে সমৃদ্ধ করে এবং সেইসাথে তাঁদের ভূয়সি প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) পুরুষদের জন্য যেমনিভাবে জুমু'আর দিনে নামায ও খুতবার ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন, শ্রবন, প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন ঠিক তিনি পরিবারের কর্তা পুরুষদের উদ্দেশ্য ফরমান জারি করেছেন– যদি তোমাদের নারীরা মসজিদে যেতে চায় তাহলে তোমরা বাঁধা দিও না।[৬৬]

অনুরূপভাবে নারীরা মসজিদ যাবে 'ইল্‌মে নববী চর্চা করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ইল্‌মী ধারাকে অব্যাহত রাখবে বলেই তিনি নারীদের এমন সুযোগ করে দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সেই সময়ের নারীর এমন বিদগ্ধতা, পাণ্ডিত্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। একজন নারী নাম উম্মু হিশাম বিনতু হারেসা তিনি বলেন, একজন নারী নবীর খুতবায় সূরা ক্বা-ফ শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলে।[৬৭]

চিন্তা করেছেন। একজন নারী কি দূর্দান্ত কাজ করেছেন। এভাবেই আমরা দেখি নারীদের 'ইল্‌মী নববী চর্চার বিশাল জায়গা এবং ধারাবাহিকতা। কোনো যুগেই তাঁদের এই খিদমত, চর্চাকে পিছিয়ে রাখতে পারেনি; বরং সকল ধরনের বাঁধা, প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙিয়ে তাঁরা 'ইল্‌মের সাথে ছিলেন, চলেছেন দূরান্ত পথ। আমরা যদি লক্ষ্য করি আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবনী। তাহলেই দেখতে পাবো তাঁদের 'ইল্‌মে নববী চর্চা ও তাঁদের কাছে সংগৃহীত হাদীসসমূহ কিভাবে হক্ব আদায় করেছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) তিনি হলেন হাদীসের জগতে নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী। মোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ছাত্রত্ব বরণ করেছেন অসংখ্য সাহাবী, তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি। ঠিক তেমনিভাবে রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীগণের দিকে লক্ষ্য করলেও এভাবেই ধারাবাহিকতা লম্বা হবে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর 'ইল্‌মে নববী চর্চার দরুন পরবর্তীতে হাদীস সংকলকগণ তাঁদের বিখ্যাত হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে 'ইল্‌মে নববী চর্চায় মহিষী নারীদের নাম পেশ করেছেন। মহিলা সাহাবী যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের বর্ণনা সহীহুল বুখারীতে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ) স্থান দিয়েছেন ৩১জনের। সহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) স্থান দিয়েছেন ৩৬জনের। সুনান আবূ দাউদের মধ্যে ৭৫, জামে' আত্ তিরমিযীতে ৪৬জন, সুনান আন্ নাসায়ীতে ৬৫জন আর সুনান ইবনু মাজাহ্‌তে ৬০জন স্থান পেয়েছে। নারীদের এই বিরল কৃতিত্ব সত্যিকারার্থে তাঁদের সম্মানকে উঁচু করে এবং সেই সাথে 'ইল্‌ম চর্চাতে নিজেকে সক্রিয় রাখতে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন:

لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة.

আলেমদের মধ্যে কারো পক্ষ থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যে, নারী হওয়ার কারণে কোনো হাদীস বর্জন করা হয়েছে।[৬৮]

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই, নারীর 'ইল্‌মী নববী চর্চা এটা যুগের পর যুগ ধারণ করে এসেছে। কোনো যুগের কোনো বাঁধাই তাঁদের দমাতে পারেনি। তাঁরা 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদত, মুয়ামালাত, ফিকহ, তাফসীর, আহকাম ইত্যাদি সকল বিষয়ে 'ইল্‌মী অবদান রেখেছেন এমনকি তাঁরা 'ইল্‌ম চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায়, অঞ্চলে সফর করেছেন। তাঁদের এই মহান ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল কেবলমাত্র 'ইল্‌ম চর্চা কেন্দ্রীক। তাই এই যুগে এসেও কেউ যদি বলে নারীদের 'ইল্‌ম চর্চার প্রয়োজন নেই কিংবা ইসলাম নারীদের 'ইল্‌ম চর্চাকে নিরুৎসাহিত করে তাহলে আপনি বুঝে নেন নিঃসন্দেহে সে জাহেল, জ্ঞান পাপী; বরং ইসলামের এই গৌরাবোজ্জ্বল সোনালী ইতিহাস নারীদের 'ইল্‌মী নববী অবদান আমাদের হাতের কাছে বিদ্যমান। সুতরাং 'ইল্‌মী নববী চর্চা, প্রচার-প্রসার হোক বিস্তৃত পরিসরে সেটাই কাম্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অগ্রগামী ভূমিকা পালন করার তাওফীক্ব দান করুক –আমীন। ☒

[৬৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৮৭।*
[৬৬] *সুনান আবূ দা'ঊদ- হা. ৫৬৭।*
[৬৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭৩।*
[৬৮] *নায়লুল আওতার- ৮/২২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ০৩-০৪ সংখ্যা ❖ ২১ অক্টোবর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৭ রবিউস্ সানি- ১৪৪৬ হি.

আলোর পরশ

সরল দীন: যা জানা আবশ্যক

–আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান

❖ আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি কয়টি ও কী কী?

✍ ইসলাম ৫টি মৌলিক স্তম্ভ বা খুঁটির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে পাঁচটি স্তম্ভকে আরকানুল ইসলাম বা ইসলামে রুকন বলা হয়। সেগুলো হলো–

০১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল।

০২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা (প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করা)।

০৩. যাকাত আদায় করা (নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত আদায় করা)।

০৪. বায়তুল্লাহ'র হজ্জ সম্পাদন করা (হজ্জের শর্তসমূহ পূরণ হওয়া সাপেক্ষে) এবং

০৫. সওম পালন করা (প্রতি বছর রমাযান মাসব্যাপী সওম পালন করা)। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৫১৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৬)*

❖ আরাকানুল ঈমান বা ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

✍ ঈমান শব্দের অর্থ 'বিশ্বাস'। পারিভাষিক অর্থে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সৃষ্টিকৃত অদৃশ্যের প্রতি দ্বিধাহীনচিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ ৬টি, যাকে আরকানুল ঈমান বলা হয়। সেগুলো হলো–

০১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব বরণ করে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

০২. ফেরেশ্তাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ- ফেরেশ্তাগণ নূর দ্বারা সৃষ্ট এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আজ্ঞাবহ। তাদের কোনো জৈবিক চাহিদা নেই।

০৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে পথ-প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণের প্রতি তাঁর বাণী সম্বলিত কিতাব প্রেরণ করেছেন। এই কিতাবসমূহের আদেশ-নিষেধ মহান আল্লাহর কালাম, তা কোনো সৃষ্ট বস্তু নয়।

০৪. রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির পথ-প্রদর্শনের জন্য ৩১৫জন রাসূল এবং অগণিত নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবী-রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে নবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

০৫. পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের ইহজাগতিক জীবন সমাপ্ত হলেও অনন্তকালের পারলৌকিক জীবনের সূচনা হয়। অতঃপর পুণ্য-পাপের বিচারে প্রত্যেককে সুখময় জান্নাত অথবা জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

০৬. ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রত্যেকের ভাগ্য সৃষ্টির পঁঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। অতএব মানুষের জীবনে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা ভাগ্যের লিখন অনুসারেই হয়ে থাকে। *(সূরা আল বাক্বারাহ: ১৭৭; সূরা আন্ নিসা: ১৩৬ ও মুত্তাফাকুন 'আলাইহি; সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭৭৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৯)*

❖ তাওহীদ পরিচয় ও প্রকারভেদ কী কী?

✍ তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। সুমহান আল্লাহর অদ্বিতীয় একক সত্তাকে তাওহীদ বলা হয়। যাবতীয় ক্ষেত্রে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার একক সত্তাকে স্বীকার করে, মনেপ্রাণে সেই বিশ্বাস লালন ও প্রতিপালন করাকে তাওহীদ বলে। তাওহীদ তিন প্রকার। যথা-

০১. তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ্। অর্থাৎ- মহাবিশ্ব পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনে মহামহিম আল্লাহ'র একক কর্তৃত্ব এবং বিশ্বময় তাঁর সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

০২. তাওহীদে উলুহিয়্যাত। সৃষ্টির যাবতীয় 'ইবাদত আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত এবং 'ইবাদত পাওয়ার অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে তাঁর অবস্থান সুনির্দিষ্ট।

০৩. তাওহীদ আসমা-উস্-সিফাত। অর্থাৎ- সুমহান আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় গুণবাচক নামের যথার্থতা একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত; এক্ষেত্রেও তিনি অদ্বিতীয় একক সত্তা। *[আবূ ইসমাঈল আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল সাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হি.), 'আক্বীদাতুস সালাফ- তাহক্বীক্বঃ বদর আল বদর (কুয়েতঃ দার সালাফিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩-৪]*

❖ উসুলস সালাসা বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো কী কী?

ঈমান গ্রহণের পর একজন মু'মিনের প্রধান দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা। এজন্য উসুলুস সালাসা বা মৌলিক তিনটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মু'মিনের উপর ফর্‌য। সেগুলো হলো–

০১. আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা। অর্থাৎ- কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই হুবহু গ্রহণ করা এবং সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে যে বুঝ গ্রহণ করেছেন, সেই বুঝের মধ্যেই নিজের বিশ্বাসকে সীমাবদ্ধ করা।

০২. দীন তথা ধর্মীয় বিধি-বিধানের জ্ঞানার্জন করা। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

০৩. নবী-রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা। অর্থাৎ- মুহাম্মদ (ﷺ) মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। নবী (ﷺ) সম্বন্ধে জানতে তাঁকে চিনতে তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন করা।

উল্লেখ্য যে, মৃত্যুর পর মানুষকে কবরস্থ করা হয়। অতঃপর দু'জন ফেরেশ্‌তা এসে কবরস্থ ব্যক্তিকে উসূলুস সালাসা বা উপরিউল্লিত তিনটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। তা হলো–

০১. "মান রব্বুকা" কে তোমার রব বা প্রতিপালক?

০২. "মা দী-নুকা" কী ছিল তোমার দীন বা জীবনব্যাবস্থা?

০৩. "মান রাসূলুকা" কে তোমার রাসূল?

❖ কয়টি বিষয়ের সমন্বয়ে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করে?

সাধারণত মনে করা হয় যে, অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়। মূলত অন্তরের বিশ্বাস হলো ঈমানের প্রথম স্তর। মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ- তিনটি বিষয় একত্রিকরণের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা আসে। তা হলো–

০১. তাসদিক বিল যিনান বা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা।

০২. ইকরার বিল লিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা এবং

০৩. 'আমল বিল আরকান বা কর্মে সম্পাদন করা। *[ইবনু মানদাহ (৩১০-৩৯৫ হি.), কিতাবুল ঈমান- তাহক্বীক্বঃ ড. আলী বিন মুহাম্মাদ আল-ফাক্বীহী (মদীনাঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৪০১/১৯৮১ খ্রি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।]*

❖ 'আমলগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মু'মিনদের স্তর কয়টি ও কী কী?

'আমলগত বৈশিষ্ট্যের দরুন ঈমানদারের মর্যাদা কমবেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ- যে যতবেশি ইখলাসপূর্ণ 'আমলে অগ্রগামী তার মর্যাদাও ততো বেশি। সে আলোকে মু'মিনদের স্তর ৩টি। যথা-

০১. সাবিকূনা ইলাল খয়রাত। অর্থাৎ- কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। তারা ঐ শ্রেণির, যারা ফর্‌য, নফল ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথ সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে।

০২. মুকতাসিদূন। অর্থাৎ- মধ্যমপন্থী ঈমানদার। তারা ফর্‌যসমূহ যথাযথ সম্পাদন করে এবং হারামকে বর্জন করে চলে এবং

০৩. যালিমূনা লি-আন্‌ফুসিহিম। অর্থাৎ- নিজেদের উপর যুল্‌মকারী। তারা ঐ শ্রেণির, যারা সৎকার্য

সম্পাদন করে, আবার মন্দকার্যও সম্পাদন করে। *(সুওয়ালুন ওয়া জাওয়াবুন ফী আহাম্মিল মুহিম্মাত- শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসের বিন সা'দী, পৃ. ১৭)*

❖ ঈমানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা কী?

ঈমান আনয়নের পর মানুষ সেই বিশ্বাস অনুপাতে কর্মে সম্পাদন করে। এই বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বিত রূপকে ঈমানের শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরেরও অধিক। তন্মধ্যে–

০১. ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা 'আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং

০২. ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা'। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫)*

❖ ঈমান বৃদ্ধির বিশেষ কোনো 'আমল আছে কী?

যে সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন মু'মিনের ঈমান বৃদ্ধি পায় তা পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। যার সারমর্ম হলো, যে কোনো সৎ 'আমল দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

০১. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। *(সূরা আল আনফাল: ২)*

০২. বেশি বেশি তাসবীহ্-তাহলীল এবং যিক্র-আযকার করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়; *(সূরা আল আনফাল: ২)*

০৩. রাসূল ও সাহাবী জীবন-চরিত অধ্যয়ন করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়;

০৪. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়;

০৫. আখেরাতমুখী হকপন্থী আলেমগণের সাহচর্যে থাকলে প্রভৃতি।

❖ কোন কোন পাপের কারণে ক্ষণিকের জন্য ঈমান ছুটে যায়?

যে সকল পাপের কারণে ক্ষণিকের জন্য ঈমান ছুটে যায় এবং পাপকর্ম থেকে বিরত হওয়ার পর পুনরায় ঈমান প্রত্যাবর্তন করে, তা নিম্নরূপ:

০১. যিনাকারী যখন যিনায় রত থাকে, তখন তার মাঝে ঈমান থাকে না এবং

০২. চোর যখন চুরিতে লিপ্ত থাকে তখনও তার মাঝে ঈমান থাকে না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৭৫)*

❖ ঈমান ভঙ্গের মৌলিক কারণ কয়টি ও কী কী?

সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে যেমন ওযু, সালাত ও সিয়াম ভঙ্গ হয়, তদরূপ ঈমান ভঙ্গেরও কতিপয় কারণ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব নাওয়াকিযুল ইসলাম নামক গ্রন্থে ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো–

১. মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা।

২. বান্দা ও মহান আল্লাহর মাঝে ঊসিলা নির্ধারণ করা।

৩. কাফিরদেরকে কাফির মনে না করা।

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরীকার চেয়ে অন্য কারো তরীকাকে অধিক পরিপূর্ণ মনে করা।

৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আনীত বিধান কিংবা বিধানের অংশ বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আনীত ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করতে কাফিরের পক্ষ অবলম্বন করা।

৯. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনীত শরীয়তকে উপেক্ষা করে বিকল্প শরীয়ত গ্রহণ করা।

১০. মহান আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া। *(নাওয়াক্বিযুল ইসলাম- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব)*

❖ কিয়ামতের ছোটো আলামতসূহ কী কী?

প্রতিটি মুসলিম মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, একদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে হঠাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে, এমনটি নয়; বরং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মানুষ তার কিছু আলামত চিহ্ন দেখতে পাবে। কিয়ামত সংঘটিত হবে পূর্বমুহূর্তে চূড়ান্ত আলামতসমূহ প্রকাশ পাবে; তার পূর্বে বেশ কিছু আলামত বা চিহ্ন প্রকাশিত হবে, যেগুলোকে হাদীসের পরিভাষায় ছোটো আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম, নবুওয়াত লাভ ও মৃত্যু কিয়ামতের প্রথম আলামত।

২. মুসলিমদের হাতে বায়তুল মাকদিস বিজয় হবে।

৩. সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে;

৪. মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং যাকাত গ্রহণের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না;

৫. নানারকম গোলযোগ ও ফিতনা বৃদ্ধি পাবে;

৬. নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে;

৭. হিজায থেকে বৃহৎ একটি আগুন বের হবে;

৮. মানুষের মাঝে আমানতদারিতা নষ্ট হয়ে যাবে।

৯. 'ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে ও অজ্ঞতা বিস্তর লাভ করবে;

১০. ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে ও সর্বত্র সুদের লেনদেন ছড়িয়ে পড়বে;

১১. ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে এবং কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে;

১২. বাদ্যযন্ত্র ও গায়ক-গায়িকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে;

১৩. মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ এটাকে হালাল মনে করবে;

১৪. অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা ও বকরির রাখাল কর্তৃক সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা;

১৫. কৃতদাসী কর্তৃক স্বীয় মনিবকে প্রসব করা;

১৬. মানুষ হত্যা ও হঠাৎ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;

১৭. অধিকহারে ভূমিকম্প হওয়া;

১৮. ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির শাস্তি দেখা দিবে;

১৯. কাপড় পরিহিতা সত্ত্বেও উলঙ্গ নারীদের বহিঃপ্রকাশ ঘটা;

২০. মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হবে;

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা বলা বৃদ্ধি পাবে;

২২. নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে;

২৩. আরব ভূখণ্ড তৃণভূমি ও নদ-নদীতে ভরে উঠবে;

২৪. ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় আবিস্কৃত হবে;

২৫. হিংস্র জীবজন্তু ও জড়ো পদার্থ মানুষের সাথে কথা বলবে;

২৬. রোমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলিমদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়া এবং

২৭. কনস্টান্টিনোপল বিজয় হওয়া প্রভৃতি। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০৫, ৭১১৮, ৩৬০৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৫১, ২৯০২, ৮, ২৮৯৪; সূরা আল ক্বামার: ১)*

❖ কিয়ামতের বড়ো আলামতসমূহ কী কী?

কিয়ামতের ছোটো আলামতসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত আলামতসমূহ প্রকাশিত হবে। যেগুলো হাদীসের ভাষায় বড়ো আলামত বলা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

১. ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব ঘটবে;

২. দাজ্জালের আগমন ঘটবে;

৩. 'ঈসা ইবনু মারইয়াম পুনরায় দুনিয়াতে আসবে;

৪. ইয়াযুয-ম'যুযের আগমন ঘটবে;

৫. পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে বড়ো ধরনের ভূমিধস হবে;

৬. আরব উপদ্বীপে একটি বড়ো ধরনের ভূমিধস হবে;

৭. বিশাল একটি ধোয়া আসমান ও জমিনের খালি জায়গা গ্রাস করে ফেলবে;

৮. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে;

৯. দাব্বাতুল আরদ নামক অদ্ভুদ এক জন্তু বের হবে;

১০. কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ইয়ামানের আদন নামক স্থানের গর্ত থেকে একটি ভয়াবহ আকারের আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশ্‌রের দিকে একত্রিত করবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২২২, ৪৬৩৬, ১৫৯১, ১৫৯৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯০১, ১৫৭, ১৫৮, ২৯০১, ২৯০৯, ২৯৪০; সুনান আবি দাউদ- হা. ৪২৮২; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২২৩০; সূরা আল 'আম্বিয়া-: ৯৬-৯৭; সূরা আদ্ দু-খান: ১০-১১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৪৯)*

কবিতা

কাঁচা মরিচ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

ফোন করে গিন্নি বলে
কাঁচা মরিচ ঘরে নাই
অফিস থেকে ফেরার পথে
বাজারদিকে পা বাড়াই-
বলছে লোকে শত-হাজার
খবরটা তো জবর তাজার!
কী খবর ভাই,কী সে খবর?
পুড়ে গেছে মরিচ বাজার!
আর দেরি নয়, ছুটে গেলাম-
সাচ্চা খবর দেখতে পেলাম
পুরো বাজার ঘুরে মরি
সবই আছি মরিচ তো নাই
ব্যাপারটা কি? বলুন কাকা,
দোকানিকে আমি শুধাই-
"শোনো তবে খবর পাকা
প্রতি কেজি পাঁচশ টাকা।"
শুনে আমার মাথায় হাত
হয়ে গেলাম কুপোকাত!

সমাপ্ত

রুপের রাণী বাংলা

আবু সালেহ আকিব*

রুপের রানী বাংলা আমার
হাওর বিলের দেশ
জলে ভরা বিলের বুকে
শাপলা ফুটে বেশ।
মেঘনা নদীর জল জলে রং
পদ্মা নদীর ঢেউ
এদেশ ছাড়া অন্য কোথাও
দেখবে না তো কেউ।
বাংলাদেশের খালে বিলে
খলছে পুঁটি মাছ
তাই না দেখে মাছরাঙ্গাটা
করছে দেখো নাচ।

সমাপ্ত

স্মরণ করি

রোকেয়া রহিম

রবের কথা স্মরণ করি
গভীর মনে নিরালায়,
কেমন করে থাকবো আমি
কবর ঘরে বিছানায়।
বিচ্ছু, সাপ ধরবে চেপে
কামড়ে খাবে হায় হায়,
পচন দেহ পোকায় খাবে
কাটবে নাকো কোনো দায়।
কবর দেশে যারাই গেছে
ফিরবে নাতো কোনোদিন,
এমনি করে বিলিন হবো
ভুলতে হবে রঙিন দিন।
কিসের বাড়ি-কিসের ঘর
থাকবো না কেউ চিরকাল,
খোদার কাছে যেতেই হবে
সামনে আসছে পরকাল।
দ্বন্দ নয়-চাইনা ক্ষতি
আরতো নয় ধান্দাবাজ-
বিভেদ ভুলে দেশ ও দশের
সবাই মিলে করবো কাজ।
জীবন ভর জমেছে পাপ
পেয়েছি কতো অভিশাপ,
চাই গো ক্ষমা দু'হাত তুলে
দয়াল যেন করেন মাফ।

সমাপ্ত

---

* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*
* *জেলা: দিনাজপুর, উপজেলা: দিনাজপুর, ডাকঘর: শহীদ হাট, পোস্ট কোড: ৫০৫২।*

কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের উদ্যোগে ত্রাণ তৎপরতা

এ বছরের বন্যায় দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস খিদমতে খালক্ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ বছর ফেনী, কুমিল্লা, সিলেট, চাঁদপুর, যশোর, সাতক্ষীরা, শেরপুর, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট প্রভৃতি জেলায় জমঈয়ত ও শুব্বানে আহলে হাদীস-এর পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস এবং জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ। এ কর্মসূচিতে বন্যার্ত মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, পোশাক, ওষুধ ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

উত্তরা এলাকা জমঈয়তের অফিস উদ্‌বোধন

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অধীন, উত্তরা সাংগঠনিক এলাকার অফিস উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে গত ১২ অক্টোবর শনিবার, মডেল টাউন উত্তরার লাভ লীন কনভেনশন হলে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান-এর পরিচালনায় বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ইঞ্জি. প্রফেসর ড. মোতাহারুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাদানী, প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী, প্রচার ও গণমাধ্যম বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ রায়হান উদ্দীন, নির্বাহী পরিষদের সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন ও অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ, ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের আহ্বায়ক আলহাজ্জ মুহাম্মদ নূরুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের সদস্যগণ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন। দারুসুল কুরআন পেশ করেন উত্তরা এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ ড. আব্দুল বাসীর বিন নওশাদ মাদানী। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন উত্তরা এলাকা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. মাশহুদুল বাসেত, বিশিষ্ট আলেম শাইখ ড. রেজাউল করীম মাদানী, শাইখ আফতাব আহমদ, তুহিন বিন সান্নাফ মোল্লা, মুহাম্মদ মোরশেদ মজুমদার প্রমুখ।

এ সভায় উত্তরা এলাকায় সেন্ট্রাল আহলে হাদীস মসজিদ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হলে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ স্বতঃস্ফূত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

দিনাজপুর জেলা জমঈয়তের সাধারণ সভা

দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের মহাসম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির জরুরি সভা গত ১৩ অক্টোবর রবিবার সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল আল মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গণী। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি লুৎফুল কবীর বকুল ও মাওলানা হাফেয আতিকুর রহমান বিন আবু তাহের বর্ধমানী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা মোখতার হোসেন শেখ।

পাঁচরুখীতে জমঈয়ত ও শুব্বানে মাসিক সভা

নারায়ণগঞ্জ জেলার পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী সভা গত ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। ছনপাড়া বন্দের বাড়ি জামে মাসজিদে পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা মনির হোসেন-এর সভাপতিত্বে বাদ আসর প্রোগ্রাম শুরু হয়। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ছনপাড়া বন্দের বাড়ি জামে মাসজিদ শাখা জমঈয়তের সভাপতি মো. শাহাদাত আলী সাগর। আলোচনায় অংশগ্রহণ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রচার ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি অধ্যক্ষ শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, জেলা জমঈয়তের দফতর সম্পাদক শাইখ সিরাজুল ইসলাম রহমানী, পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তের প্রচার সম্পাদক শাইখ আবু হানিফ, মসজিদের খতীব শাইখ বেলাল হোসাইন ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য মো. রমজান মিয়া প্রমুখ।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি আলহাজ্জ মো. নাছির ভূঁইয়া ও ছনপাড়া বন্দের বাড়ি জামে মাসজিদের সেক্রেটারি মো. মোহসিন ভূঁইয়া।

মৃত্যু সংবাদ

(এক) আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ঘনিষ্ট সহচর, বিশিষ্ট সমাজসেবক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মৌলবী রঈসুদ্দীন আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর তৃতীয় কন্যা হোমায়রা রহমান গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মাইয়্যিত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ যিল্লুল বাসেত (রাহিমাহুল্লাহ)'র শালিকা। তার গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার গোয়ালদি গ্রামে। গোয়ালদি ঈদগাহ্ মাঠে জানাযা শেষে তাকে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ১ পুত্র ২ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি অত্যন্ত পর্দানশিন, আবেদা ও দানশীলা নারী ছিলেন। স্বামী সাদেকুর রহমান সোনার গা পৌরসভার সুদীর্ঘ ৩৬ বছরের জনপ্রিয় মেয়র ছিলেন।

মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দু'আ চেয়েছেন তার বোনের ছেলে উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত।

আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যিতকে ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে সরবে জামিল দান করুন।

(দুই) সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ এলাকা জমঈয়তের আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মৌলভী মো. শহিদুর রহমান মাস্টার গত ১৩ অক্টোবর রবিবার, বিকাল ৪টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জমঈয়ত তথা সমাজের বিভিন্ন কাজে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন। মাইয়্যিতের জানাযা চরকুশাবাড়ী দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন ছোটো ভাই আলহাজ্জ মো. জাহিদুর রহমান। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমের নিকট তার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ চাওয়া হয়েছে।

অফিস সহায়ক আবশ্যক

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ, বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯-এর জন্য একজন সৎ, যোগ্য ও কর্মঠ অফিস সহায়ক আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এসএসসি বা সমমান পাশ। আলোচনাক্রমে বেতন ভাতা নির্ধারণ করা হবে।

যোগাযোগ– ০১৩২৯-৭২৮৩৮৪
০১৭৭৪-৭০৯৯০০

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

শীত আসন্নঃ শ্বাসকষ্ট থেকে বাঁচার উপায়?

শীত এসেছে। কমছে তাপমাত্রা। বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণও কমছে। এই সময়ে অনেকেরই শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়।

কেন শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ে? কী করেই বা এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচবেন? শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে– ⇨ বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ এই সময়ে অনেকটা কমে যায়। বাড়ে ধুলার পরিমাণ। সেগুলোই ফুসফুসে ঢুকে শ্বাসের সমস্যা বাড়ায়। ⇨ বাতাসে ফুলের রেণুও এই সময় প্রচুর পরিমাণে ওড়ে। ফুসফুসে ঢুকে সেগুলোও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। শ্বাসকষ্ট বাড়ে। ⇨ শীতকালে বায়ুদূষণের পরিমাণও অনেক বেড়ে যায়। এটি শ্বাসকষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ।

কী করে এই সমস্যা থেকে বাঁচবেন? ⇨ বাড়ির বাইরে বের হতে হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। বিশেষ করে যাদের শ্বাসের সমস্যা রয়েছে, তারা এই সময়ে মাস্ক ব্যবহার করলে সমস্যা কিছুটা কমতে পারে। ⇨ তবে শুধু বাড়ির বাইরে নয়, ঘরের ভেতরও পরিষ্কার রাখা উচিত এই সময়। না হলে ঘরের ধুলাও শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ⇨ ঘরের ধুলার মধ্যে বড়ো অংশই হলো শুষ্ক ত্বকের গুঁড়ো। শীতকালে নিয়মিত ময়শ্চারাইজার মাখলে ত্বকের শুষ্কতা কমবে। ফলে ধুলার পরিমাণও কিছুটা কমবে। শ্বাসকষ্টও বাড়বে না। ⇨ শীতকালে অবশ্যই ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। যাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তারা যদি শীতে ধূমপান করেন, তাদের ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে। তাই ধূমপানের অভ্যাস এই সময়ে ছাড়তে হবেই। *[সূত্রঃ নয়া দিগন্ত অনলাইন]*

গরম পানির যত উপকারিতা

পানি পানে অনেক উপকার তা আমরা সবাই জানি। তবে ঠাণ্ডা না গরম এই নিয়ে সব সময় বিতর্ক চলে। পানি ঠাণ্ডা হোক বা গরম দুটোতেই কিছু না কিছু উপকার থাকে। তবে আজকে জানাবো গরম পানির বিশেষ উপকারিতা সম্পর্কে।

একদল জাপানি চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন যে, কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে গরম পানি থেরাপি ১০০% কার্যকর। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– মাইগ্রেন, উচ্চ রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ, জয়েন্ট-এর ব্যথা, হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি এবং হ্রাস, মৃগী রোগ, কোলেস্টেরলের মাত্রা, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি, গাটের ব্যথা, হাঁপানি রোগ, ফোঁস কাশি, শিরায় বাধা, জরাছু ও মূত্র সম্পর্কিত রোগ, পেটের সমস্যা, ক্ষুধার সমস্যা, মাথা ব্যথা। এছাড়াও চোখ, কান এবং গলা সম্পর্কিত সমস্ত রোগেও গরম পানি বেশ কার্যকর।

কীভাবে গরম পানি পান করবেন?

নিয়মিত রাত ১০-১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে ২ গ্লাস গরম পানি পান করতে হবে। প্রথম দিকে ২ গ্লাস পানি পান করতে সক্ষম নাও হতে পারে, এ ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে এটি করতে পারবে। গরম পানি পান করার পরে ৪৫ মিনিট কোনো কিছুই খাওয়া যাবে না। গরম পানি থেরাপি যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে যে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে– ♦ ৩০ দিনের মধ্যে ডায়াবেটিস। ♦ ৩০ দিনের মধ্যে রক্তচাপ। ♦ ১০ দিনের মধ্যে পেটের সমস্যা। ♦ ৯ মাসের মধ্যে সমস্ত ধরণের ক্যান্সার। ♦ ৬ মাসের মধ্যে শিরার বাধার সমস্যা। ♦ ১০ দিনের মধ্যে ক্ষুধা জাতীয় সমস্যা। ♦ ১০ দিনের মধ্যে জরায়ু এবং এর সম্পর্কিত রোগ। ♦ ১০ দিনের মধ্যে নাক, কান এবং গলার সমস্যা। ♦ ১৫ দিনের মধ্যে মহিলাদের সমস্যা। ♦ ৩০ দিনের মধ্যে হৃদরোগ জাতীয় সমস্যা। ♦ ৩ দিনের মধ্যে মাথা ব্যাথা, মাইগ্রেন সমস্যা। ♦ ৪ মাসের মধ্যে কোলেস্টেরল সমস্যা। ♦ ৯ মাসের মধ্যে মৃগী এবং পক্ষাঘাত সমস্যা। ♦ ৪ মাসের মধ্যে হাঁপানি সমস্যা।

গরম পানির উপকারিতাঃ

১. কোষ্ঠকাঠিন্য বা শরীর কড়া থেকে রক্ষা করে। শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ হলে কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকবে না।

২. পিরিয়ডের সময়ে মেনস্ট্রুয়াল ক্র্যাম্পের প্রকোপ কমাতে গরম পানির কোনো বিকল্প হয় না। এই সময় গরম পানি পান করা শুরু করলে অ্যাবডোমিনাল মাসলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে ব্যথা কমতে সময় লাগে না।

৩. শরীর ও মাথার স্ট্রেস কমিয়ে দেয়। সারাদিন কাজ করে আমাদের যে ক্লান্তিবোধ আসে, তা দূর করে।

৪. খুশকির প্রকোপ কমাতে গরম পানি বেশ কার্যকরী। সারাদিন ধরে গরম পানি পান করলে নানা কারণে স্কাল্পের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা ফিরে আসে। ফলে খুশকি দ্রুত কমে।

৫. সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে গরম পানি খেতে থাকলে একদিকে যেমন শরীরে পানির ঘাটতি দূর হয়, তেমনি শরীরের ভিতরে নানা পরিবর্তন হতে শুরু করে, যার প্রভাবে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা তো দূর হয়ই, সেইসঙ্গে ত্বকে প্রবাহের মাত্রা বাড়তে শুরু করায় স্কিন টোনের উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না।

৬. একলাসিয়া থেকে শরীরকে রক্ষা করে। একলাসিয়া শরীরে খাবারকে আটকে রাখার প্রবণতা বাড়ায়। পানি এ ধরনের সমস্যা দূর করে।

৭. গরম পানি স্কিন সেলের ক্ষত সারিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে ত্বক টান টান হয়ে ওঠে এবং বলিরেখাও হ্রাস পায়। ফলে বয়সের কোনো ছাপই ত্বকের উপর পরতে পারে না।

৮. গরম পানি খাওয়া শুরু করলে প্রতিটি হেয়ার সেলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে হেয়ার ফলের মাত্রা তো কমেই, সেইসঙ্গে চুলের সৌন্দর্য বাড়ে চোখে পরার মতো।
৯. গরম পানি খাওয়া মাত্র শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। ফলে ঘাম হতে শুরু হয়। আর ঘামের মাধ্যমে টক্সিন বেরিয়ে যেতে শুরু করে। এতে করে শরীর সহজেই বিষমুক্ত হয়।
১০. অতিরিক্ত ওজনের কারণে চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে আজ থেকেই গরম পানি খাওয়া শুরু করুন। ফল পাবেন একেবারে হাতে নাতে। গরম পানি খেলে হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। ফলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমার সুযোগই থাকে না।

ঠাণ্ডা পানি ক্ষতির কারণ: মনে রাখতে হবে ঠাণ্ডা পানি পান করা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যদি অল্প বয়সে ঠাণ্ডা পানি পান প্রভাবিত না করে, তবে এটি বৃদ্ধ বয়সে ক্ষতি করবেই। ঠাণ্ডা পানি হার্টের ৪টি শিরা বন্ধ করে দেয় এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়। হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কস। এটি লিভারেও সমস্যা তৈরি করে। এটি লিভারের সাথে ফ্যাট আটকে রাখে। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের অপেক্ষায় থাকা বেশিরভাগ মানুষ ঠাণ্ডা পানি পান করার কারণে এর শিকার হয়েছেন।
এছাড়া ঠাণ্ডা পানি পেটের অভ্যন্তরীণ দেয়ালকে প্রভাবিত করে। এটি বৃহত অন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং ফলস্বরূপ ক্যান্সারে রূপ নেয়। *[সূত্র: একুশে টেলিভিশন অন-লাইন]*

শহুরে কিশোর-কিশোরীরা মারাত্মক মানসিক চাপে

বাংলাদেশের ১৩-১৯ বছর বয়সী শহুরে ছেলে-মেয়েদের ৬০ শতাংশের বেশি মাঝারি থেকে তীব্র মানসিক চাপে ভোগে বলে সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে। এই স্ট্রেস বা মানসিক চাপের ফলে তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যেমন- নাগরিক এই কিশোর-কিশোরীদের একটি বড়ো অংশ স্থূলতা এবং বিষণ্নতা বা অবসাদে ভোগে।
এ ছাড়া শহুরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত খেলাধুলা এবং কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে মাত্র আড়াই শতাংশের কিছু বেশি কিশোর-কিশোরী। বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন, পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি সংস্থার করা যৌথ এই গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তানদের এ ধরনের মানসিক চাপের ব্যাপারে পরিবারে বা অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা খুবই কম। ফলে মানসিক চাপ সামলাতে পরিবার এবং স্কুলের সহায়তাও খুবই কম পায় তারা।

কী নিয়ে মানসিক চাপে থাকে কিশোর-কিশোরীরা?

গবেষণার একজন সহ-গবেষক আমব্রিনা ফেরদৌস বলেছেন, জরিপটি মহামারি শুরুর আগে ২০১৯ সালে ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল বিএমআরসি গবেষণা নিবন্ধটি অনুমোদন দিয়েছে।

গবেষণাটি ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী সাড়ে চার হাজারের বেশি কিশোর-কিশোরীর সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে সারা পৃথিবীতেই ছেলে-মেয়েরা নানারকম মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। আর হরমোনের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশার চাপ। ভালো স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া, ভালো ফলসহ শিক্ষা কার্যক্রমে সাফল্য এমন নানাবিধ চাপ তৈরি হয় ছেলে-মেয়েদের ওপর।

গবেষণায় দেখা গেছে ছেলে-মেয়েরা সবচেয়ে বেশি মানসিক চাপ বোধ করে পড়াশোনা নিয়ে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, স্কুলের পারফরম্যান্স এবং রোমান্টিক সম্পর্কের কারণেও মানসিক চাপে পড়ে তারা।

আবার নিজেদের শারীরিক অবয়ব মানে তাদের কেমন দেখাচ্ছে, তা নিয়েও এ বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা বিরাট স্ট্রেস তৈরি হয়। এর একটা কারণ হচ্ছে, শহুরে ছেলে-মেয়েদের খাদ্যাভ্যাসে জাঙ্কফুড খাওয়ার প্রবণতা বেশি। আর খেলাধুলার সুযোগও কম, ফলে তাদের মধ্যে ওবেসিটির (স্থূলতা) সমস্যা প্রকটভাবে রয়েছে।

কারণ কী এই মানসিক চাপ?

সহ-গবেষক ফেরদৌস বলেছেন, তারা দেখতে পেয়েছেন কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েদের মঙ্গে মা-বাবার মানসিক দূরত্ব, নাগরিক জীবনে একক পরিবার কাঠামোর কারণে একাকিত্ব, স্কুলে বা অবসর সময়ে সমবয়সীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বুলিয়িং- এসব কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

মানসিক চাপের কারণে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের জীবনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। প্রায়শই তারা নিজেদের সমস্যার কথা পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে না।

কতটা ব্যাপক এই সমস্যা?

গবেষণায় পাওয়া তথ্য বলছে, ২৬ শতাংশের বেশি শহুরে কিশোর-কিশোরীর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া ৩০ শতাংশের বেশি ছেলে-মেয়ে দিনের বড়ো সময়টি বাড়ির ভেতরেই থাকে। এ ছাড়া ঘরের বাইরে খেলাধুলা এবং কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে মাত্র ২.৬ শতাংশ কিশোর-কিশোরী।

শহর এলাকায় খোলা জায়গার অভাব এবং ইনডোর গেমের প্রতি আকর্ষণের কারণে ওবেসিটির সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

সমস্যা চিহ্নিত করে, একে এড়িয়ে না গিয়ে সমাধানের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে গবেষণায়।

[সূত্র: বিবিসি বাংলা, কালেরকণ্ঠ]

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***মাঝে মাঝে আমার মনে এমন চিন্তা আসে, যাতে আমি বুঝি এটা পাপের চিন্তা বা ঈমান নষ্ট হওয়ার চিন্তা। এসব চিন্তা মনে আসলে আমার পাপ হবে কি?***

আব্দুর রাজ্জাক
বেরাইদ, ঢাকা।

জবাব: আপনার অনিচ্ছাকৃত যে চিন্তা আপনার মনে উদ্রেক হয়, তা যদি আপনি কোনোরূপ বাস্তবায়ন না করেন তাতে আপনার পাপ হবে না ইন্শা-আল্লাহ। প্রিয় নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন:

«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তর যা উদ্রেক করে তা সে কাজে বা কথায় বাস্তবায়ন না করলে সেটিকে ধরেন না।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৬৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১২৭)***

সুতরাং আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনার অন্তরে কোনোরূপ পাপ চিন্তা বা ঈমান নষ্টের কুচিন্তা উদয় হলেও। তবে আপনি সব সময় সৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকার চেষ্টা করবেন। খারাপ চিন্তা থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাইবেন। এমন ধরনের চিন্তার উদ্রেক হলেই শয়ত্বান থেকে পানাহ চেয়ে أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বেন।

জিজ্ঞাসা (০২): ***সালাতের শুরুতে নাওয়াইতুওয়ান দু'আ পড়ার হুকুম কি? এই দু'আ যেসব ইমামগণ পড়েন বা বিদআত করেন তাদের পিছনে সালাত পড়া শুদ্ধ হবে কি?***

রকিবুর রহমান
চণ্ডিপুর, ঝিনাইদহ।

জবাব: সলাতের শুরুতে نَوَيْتُ পড়ে নিয়ত করা বিদআতের মধ্যে গণ্য। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে এমন 'আমল করল যে 'আমল আমরা করিনি, তা প্রত্যাখ্যাত।" ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)***

মুখে নিয়ত পড়ে সলাত আরম্ভ করার 'আমল মহানবী (ﷺ) এবং সাহাবীগণ থেকে আদৌ প্রমাণিত নয়। বিধায় তা বিদআত। যে বিদআত কুফ্রী পর্যায়ের নয় এমতাবস্থায় ত্রুটিমুক্ত ইমাম না থাকলে সেই ধরনের বিদআতকারী ইমামের পিছনে সলাত শুদ্ধ হবে। মুখে নিয়ত পড়া ইমামের পিছনে সলাত শুদ্ধ হবে, তবে বিদআত মুক্ত ইমামের পিছনে সলাত আদায়ের চেষ্টা করা বাঞ্চনীয়। ***(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- ৭/৩৬৪)***

জিজ্ঞাসা (০৩): ***আমরা জানি যে, আদিম মানুষেরা গুহায় বসবাস করত এবং লতাপাতা ও পশুপাখির চামড়াকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করত। এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।***

আব্দুল আওয়াল
সিরাজগঞ্জ সদর।

জবাব: আল-কুরআন থেকেই বিজ্ঞানের সূচনা। প্রাচীনকালের মানুষের পোশাক, বাসস্থান সম্পর্কে ইসলাম সম্যক ধারণা দিয়েছে। আদি মানব আদম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾

"এভাবে সে ধোঁকা দিয়ে তাদের অধঃপতন ঘটিয়ে দিলো। যখন তারা গাছের ফলের স্বাদ নিলো, তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হয়ে গেল, তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলো...।" *(সূরা আল আ'রাফ: ২২)*

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾

"অতঃপর তারা দু'জনে তা থেকে খেলো তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল, আর তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল।" *(সূরা ত্বোয়াহা: ১২১)*

বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতে মহান আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ ○ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ﴾

"আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের আরাম শান্তির জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি পশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমরা হালকা বোধ করো তোমাদের ভ্রমনকালে কিংবা অবস্থানকালে। তিনি ওগুলোর পশম, লোম আর চুল থেকে তোমাদের পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য সামগ্রির ব্যবস্থা করেছেন। যা তোমারা কিছুকাল পর্যন্ত কাজে লাগাবে। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তাথেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের আত্মগোপনের জায়গা বানিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে। আর দিয়েছেন এমন পোশাক যা তোমাদেরকে সংঘাতের সময় রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের জন্য তার নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা তার প্রতি আত্মসমর্পণ করো।" *(সূরা আন্ নাহ্ল: ৮০ ও ৮১)*

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, প্রাচীন যুগে মানুষেরা প্রাকৃতিক এ নিয়ামত দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতেন এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতেন। সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে।

জিজ্ঞাসা (০৪): "মায়ের পায়ের নিচে বেহেশ্ত" কথাটির সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন?

হাসানুল ইসলাম

জয়পুরহাট।

জবাব: আরবী ভাষায় বলা হয়–

«الجنة تحت أقدام الأمهات».

"মায়ের পদতলে জান্নাত –এরূপ শব্দে এটি জাল হাদীস।" *(সিলসিলা য'ঈফাহ্- হা. ৫৯৩)*

তবে আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজাহ্'য় সহীহভাবে প্রমাণিত যে, সাহাবী জাহিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি মা আছে? সাহাবী বললেন: হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন:

«فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا».

তুমি তার (মায়ের) সেবায় নিয়োজিত থাকো। কেননা তার দুই পদতলে জান্নাত। *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩১০৪, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৭৮১)*

জিজ্ঞাসা (০৫): প্যান্টের পায়া বা শার্ট কিংবা পাঞ্জাবীর হাতা গুটানো অবস্থায় সালাত আদায় করলে সে সালাত হবে কি-না? জনৈক 'আলেম এমন অবস্থায় সালাত আদায় করলে সে সালাত হবে না –মর্মে ফাতাওয়া দিয়েছেন।

জয়নুল আবেদীন

গোদগাড়ী, রাজশাহী।

জবাব: কাপড় গুটানো বা ভাজ করা অবস্থায় সালাত আদায় করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজ। তবে এ কারণে সালাত হবে না –এমন বক্তব্য সঠিক নয়। প্যান্ট, লুঙ্গি, পাজামা, জুব্বা যাই হোক টাকনোর নিচে ঝুলে পড়া হারাম। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

ইযার (লুঙ্গি) টাকনোর যতখানি নিচে পড়বে, ততখানি জাহান্নামের আগুনে যাবে। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮৭)***

নবী (ﷺ) আরো ইরশাদ করেছেন:

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ.

লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান হতে বেঁচে থাকো, কেননা নিশ্চয়ই তা গর্ব-অহংকারের অন্তর্ভুক্ত; আর আল্লাহ তা'আলা গর্ব-অহংকারকে পছন্দ করেন না। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৮৪, হাদীসটি সহীহ)***

লুঙ্গি, প্যান্ট-পাজামা টাকনোর নিচে পরিধান করা চরমভাবে নিষিদ্ধ, আবার সালাতে কাপড় গুটিয়ে রাখাও নিষিদ্ধ। টাকনোর নিচে কাপড় পরিধান করা সালাত কিংবা সালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

এই বিষয়ে সমন্বয়মূলক বক্তব্য রেখে ইমাম নাব্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কাপড় গুটিয়ে সালাত আদায় করা সকল 'আলেমের ঐকমত্যে নিষিদ্ধ। এটা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। যদি কেউ এভাবে সালাত আদায় করে তবে তা নিন্দনীয় হবে এবং সালাত শুদ্ধ হবে না। ***(তুহফাতুল মিনহাজ- ইমাম নাব্বী, ২য় খণ্ড, ১৬১-১৬২ পৃ.)***

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে–

"টাকনোর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান পূর্বক সালাত আদায় করা বৈধ নয়। ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো তার কাপড় টাকনোর উপর থেকে নিয়ে পায়ের নলার অর্ধাংশে রাখা। যদি এটি সম্ভবপর না হয় হবে ব্যক্তি সালাতে প্রবেশের পূর্বে তার প্যান্ট উপরে উঠাবে যাতে তা টাকনোদ্বয়ের উপরে থাকে।" ***(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- ফাতাওয়া নং- ১৯৪৯৭)***

জিজ্ঞাসা (০৬): ইদানিং আমাদের দেশে নারীরাও দাওয়াতি কাজ করছেন। আমার প্রশ্ন হলো– নারীরা দাওয়াতি কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে কি?

হাফেয মুহা. ইদ্রিস

নোয়াপাড়া, যশোর।

জবাব: দীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। তদ্রুপভাবে দীনের দা'ওয়াতী কাজ নারী-পুরুষ সকলেই করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি; আমি এবং আমার অনুসারীগণ দিব্য জ্ঞানসহ আহ্বান করি; আল্লাহ মহান ও পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" ***(সূরা ইউসুফ: ১০৮)***

মহিলাদের দীনী দা'ওয়াতের চিত্র কী হবে, তার নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে পাওয়া যায়,

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

"তোমাদের গৃহসমূহে আল্লাহর আয়াতসমূহ যা তিলাওয়াত করা হয় এবং হিকমাত [নবী (ﷺ)-এর বাণী] যা পাঠ করা হয়, তা স্মরণ রেখে চলো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।" ***(সূরা আল আহ্যা-ব: ৩৪)***

কুরআন কারীমের উক্ত আয়াত নির্দেশ করে যে, নারী নিজ আবাসে কুরআন ও হাদীসের চর্চা করবে, পঠন-পাঠনে অংশ গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী জীবন-যাপনে মনোযোগী হবে। একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামী গৃহে নারীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا.

"নারী (স্ত্রী) স্বামী গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫১৮৮)*

হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন–

الراعي: هُوَ الْحَافِظ المؤتمن الْمُلْتَزم صَلَاح مَا قَامَ عَلَيْهِ.

الراعي হচ্ছে হিফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্য একান্ত বাধ্য। *(সুযদাতুল ক্বারী- ৬/১৯০ পৃ.)*

কোনো নারী তার নিজ পরিসরে দা'ওয়াতি কাজের আঞ্জাম দিবে এটি তার জন্য করণীয়, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদীস শাস্ত্রে বড় পারদর্শী ছিলেন। তথাপি দূর দূরান্তে গিয়ে তিনি দীনী দা'ওয়াত দিতেন এমনটি দেখা যায় না।

আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর কাছে কোনো হাদীস দুর্বোধ্য মনে হলে আমরা সে বিষয়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাসিল করতাম। *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৮৮৩, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (০৭): *আমাদের সমাজের মসজিদগুলোতে ইমাম সাহেব যখন সূরা আত্ তীন পড়েন, তখন মুসল্লিরা শেষোক্ত আয়াতের জবাবে একটি বাক্য পাঠ করেন। আমার জিজ্ঞাসা– সূরা আত্ তীন পড়া শেষ হলে এর জবাব দেয়া সংক্রান্ত হাদীসখানা সহীহ না য'ঈফ?*

আসাদুল ইসলাম

সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

জবাব: আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, সূরা আত্ তীন পাঠের পর بَلِي وَأَنَا عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলতে হবে। এ রীতি অনুসরণ করে কেউ কেউ সূরাটি পাঠ শেষে উক্ত বাক্যখানা স্ব-শব্দে কিংবা নিরবে পাঠ করে থাকেন। আসলে এ সংক্রান্ত হাদীস সহীহ নয়। কাজেই তা পড়তে হবে না। *(দেখুন: সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৮৮৭, য'ঈফ; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩৪৭, য'ঈফ ও য'ঈফুল জামে' লিল আলবানী- হা. ৫৭৮৪)*

জিজ্ঞাসা (০৮): *আমি কুরআন কারীমের কিছু মূল্যবান দু'আ জানি। সাজদায় গিয়ে সে দু'আগুলো পড়তে খুব ইচ্ছা করে। কিন্তু শুনেছি সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ, এমতাবস্থায় আমি কি কুরআনের দু'আগুলো সাজদায় পড়তে পারব না?*

আশ্রাফুল ইসলাম

বিরল, দিনাজপুর।

জবাব: রুকূ' এবং সাজদাতে স্বাভাবিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে দু'আ হিসাবে কুরআন কারীমের দু'আমূলক আয়াত থেকে পড়া বৈধ রয়েছে।

রুকূ' এবং সাজদাতে কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ হওয়া বিষয়ে নবী (ﷺ)-এর ইরশাদ নিম্নরূপ:

عَنْ عَلِيِّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنَّ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا».

"'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকূ' এবং সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করেছেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮০)*

এর অন্তর্নিহিত কারণ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"কারণ হলো কুরআন হলো মহান আল্লাহর বাণী, শ্রেষ্ঠ বাণী, আর রুকূ' ও সাজদার অবস্থাটি হলো বান্দার নিচু এবং ক্ষুদ্র হওয়ার একটা চরম অবস্থা। বিধায় এ দু' অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত না করাই আদবপূর্ণ।" *(মাজমূ' আল ফাতাওয়া- ৫/৩৩৮)*

তবে সাজদাহ্ অবস্থায় দু'আর বিষয়টি বান্দার নম্রতার সাথে আর দু'আ ও তিলাওয়াত অনেকটা ভিন্ন বিষয়, বিধায় সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন দু'আ হিসেবে বৈধ রয়েছে। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া আল্ লাজনা আদ্ দায়িমা গ্রন্থে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য রয়েছে।

لَا بَأْسَ بِذلك إذا أُتِيَ بِهَا عَلَى وَجْهِ الدعَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ لِلْقُرْآنِ.

"তিলাওয়াত হিসাবে না করে (সাজদাতে) দু'আ হিসাবে কুরআন পড়াতে কোনো সমস্যা নেই।" *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- ৬/৪৪৩)*

জিজ্ঞাসা (০৯): ***যারা নাস্তিক তারা কি কাফির? স্বামী যদি নাস্তিক হয়, তবে মুমিনা স্ত্রীর সাথে তার স্বাভাবিকভাবেই (অটোমেটিক) বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, না-কি স্ত্রীকে খোলা নিতে হবে? কোনো মু'মিনা স্ত্রী নাস্তিক স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে কী?***

মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

জবাব: যারা নাস্তিক তারা অবশ্যই কাফির। বৈবাহিক জীবন বৈধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো স্বামী স্ত্রী উভয়কে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের যে কোনো একজন নাস্তিক বা কাফির হলে এ দাম্পত্য জীবন বৈধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ﴾

"যদি তোমরা জানো যে (হিজরাতকারী) মেয়েরা মু'মিন তাহলে তাদেরকে কাফিরদের (স্বামী বা অভিভাবকের) কাছে ফিরিয়ে দিও না। কারণ মু'মিন নারীরা কাফির পুরুষদের জন্য বৈধ নয় অনুরূপ কাফির পুরুষরা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।" *(সূরা আল মুমতাহিনাহ: ১০)*

অতএব স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের কেউ কাফির হয়ে গেলে কোনো তালাক বা খোলার প্রয়োজন হবে না এমনিতেই তারা একে অপরের জন্য অবৈধ হয়ে যাবে এবং তাদের ঘর সংসার করাও সম্পূণ অবৈধ বা হারাম হবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০): ***একটি বাড়ীর পার্শ্বে পুরাতন কবর আছে। এক্ষণে বাড়ীটি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অথচ বাড়ীর পার্শ্বে কবর থাকায় সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কবরটি স্থানান্তর করা যাবে কী?***

আব্দুস সাত্তার

সাভার, ঢাকা।

জবাব: মুসলিম ব্যক্তি জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় সম্মানিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:

(كسر عظم الميت ككسره حيا) "মৃত ব্যক্তির হাড়ে আঘাত করা বা ভেঙ্গে দেয়া জীবিত অবস্থায় ভেঙ্গে দেয়ার ন্যায়।" *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৪৭৩৯; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩২০৭; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৩১৬৭)*

সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে কষ্টমুক্ত রাখা প্রতিটি মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। এজন্য দাফনের পর করব ভেঙ্গে ফেলা বা স্থানান্তর করা সাধারণত নিষিদ্ধ; কেননা এতে মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া হয়।

তবে মৃত ব্যক্তির প্রয়োজনে তার সম্মান মর্যাদা রক্ষার্থে মৃতদেহ স্থানান্তর করা জায়িয রয়েছে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৫১; মাজমূ' ফাতাওয়া ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্- ২৪ খণ্ড, ৩০৩ পৃ.; সৌদী স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া- ৫ম খণ্ড, ২৪১ পৃ.)*

যদি কবর অতি প্রাচীন হয়, যেখানে মৃত দেহ বা অংশবিশেষ অক্ষত নেই, সবই মাটি হয়ে গেছে এবং জায়গাটি কোনো নির্ধারিত কবরস্থান নয়। এমন কবরের জায়গা যে কোনো কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি পাওয়া গেলে তা অবশ্যই সম্মানের সাথে কবরস্থানে স্থানান্তর করতে হবে। *(মাজমূ' ইমাম নববী- ৫ম খণ্ড, ৩০৩ পৃ.; মাজমূ' ফাতাওয়া ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্- ২৪ খণ্ড, ৩০৩ পৃ.; আহকামুল জানায়িয- ২৯৮ পৃ.; ফাতাওয়া আলবানী- মাজালাতুত তাওহীদ, ৮ম সংখ্যা, ১৪২০ হি.; মাজমূ' ইবনু বায- ১৩ খণ্ড, ৩৫৯ পৃ.; মাজমূ' ইবনু উসাইমীন- ১৭ খণ্ড, ২০৩ পৃ.; সৌদী স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া- ৫ম খণ্ড, ২৪১ পৃ.; মাজালাতুল বুহুস আল ইসলামীয়াহ- ৭৬ সংখ্যা, ৫৩ পৃ. ইত্যাদি)*

অতএব এ জবাবের আলোকে প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে। –ওয়াল্লাহু তা'আলা আ'লাম। ☒

প্রচ্ছদ রচনা

হাদুম মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

ইউরোপের বলকান অঞ্চলে পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বশেষ স্বাধীন হওয়া মুসলিম রাষ্ট্র কসোভো। যে দেশের ইতিহাসে ইসলামের প্রবেশ ঘটে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কসোভো যুদ্ধের পর। আজও মুসলিম ঐতিহ্যের এক শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কসোভো। এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো হাদুম মসজিদ। ষোড়শ শতকের শেষ দশকে গাজাকোভা নগরীতে নির্মিত এই মসজিদ আজও ইসলামিক-কসোভার স্থাপত্যশৈলীর এক চমৎকার উদাহরণ। মসজিদটি হাদুম সিলেজমান এফেন্ডি নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অর্থায়নে নির্মিত হওয়ায় তার নামেই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে। হাদুম মসজিদ একটি আয়তক্ষেত্রাকার, গম্বুজ আচ্ছাদিত কাঠামো যা ইসলামী স্থাপত্যের ক্লাসিক রূপকে ধারণ করে। মসজিদটির প্রবেশদ্বার অলঙ্কৃত ফুলের পেইন্টিং, জ্যামিতিক আকৃতি ও কোরানের উদ্ধৃতিতে। এই সজ্জা মসজিদের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিকতার এক সুদৃঢ় মিলন তৈরি করেছে। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর হামাম ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কসোভো যুদ্ধের সময় আশেপাশের কমপ্লেক্স পুড়ে যায়। মসজিদ ও মিনার ব্যতীত অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এর স্থাপত্য ও ঐতিহ্য আজও লোকদের মধ্যে জীবিত। হাদুম মসজিদের সালাতের কক্ষটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত, যেখানে গম্বুজের ব্যাস ১৩.৫ মিটার এবং সিলিংয়ের উচ্চতা ১২.৬ মিটার। সালাতের কক্ষটি প্রাকৃতিক আলো-বাতাস প্রবাহিত করার জন্য ১১টি সুপরিকল্পিত জানালা রয়েছে। মিহরাব ও মিম্বর, মসজিদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। গ্যালারিটি সম্পূর্ণরূপে কাঠের নির্মিত, যা প্রার্থনা হলের স্থাপত্যকে সমৃদ্ধ করে। মসজিদটির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মিনার সালাতের স্থান থেকে ডানদিকে অবস্থিত, এটি সালাতের সময় আযান দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। হাদুম মসজিদে মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গীকার ও ইতিহাসের অম্লান চিহ্ন হিসেবে আরাবেস্ক এবং ম্যুরাল সজ্জা দেখতে পাওয়া যায়। গম্বুজের অভ্যন্তরভাগে সেকো কৌশলের ম্যুরাল সমৃদ্ধ, যা স্থলসীমানার মোটিফ, ফুলের অলঙ্করণ ও কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে সাজানো। এই সজ্জা ইসলামী-আলবেনিয়ান বারোক শৈলীর উদাহরণ। কসোভোর ইতিহাস অত্যন্ত কঠিন, যেখানে বহু বছর ধরে মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত এসেছে। তবে, সম্প্রতি কসোভোর সরকারের উদ্যোগে নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই উদ্যম মুসলমানদের জন্য নতুন আশা ও শক্তি প্রদান করেছে। যুগোস্লাভিয়ার গত ৭০ বছরের শাসনে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মন্টেনিগ্রো ও সার্বিয়া থেকে কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফলে বর্তমানে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। নতুন মসজিদ-মাদ্‌রাসা নির্মাণের মাধ্যমে কসোভোতে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কসোভোকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা কসোভোর মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বাংলাদেশের সমর্থনের প্রতীক। ২০১৮ সালে কসোভোর স্বাধীনতার ১০ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ কসোভোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক কসোভোর মুসলিম জনগণের আত্মবিশ্বাসে নতুন উদ্যম জোগাবে। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

সূচীপত্র

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৪৩	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১
০২	০৪:৪৩	০৬:০৪	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৫০
০৩	০৪:৪৪	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৪৯
০৪	০৪:৪৪	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৯	০৬:৪৯
০৫	০৪:৪৫	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৪৮
০৬	০৪:৪৫	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৪৮
০৭	০৪:৪৬	০৬:০৭	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৪৭
০৮	০৪:৪৬	০৬:০৮	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৪৭
০৯	০৪:৪৭	০৬:০৮	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৪৬
১০	০৪:৪৭	০৬:০৯	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৬	০৬:৪৬
১১	০৪:৪৮	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১২	০৪:৪৮	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৩	০৪:৪৯	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৪	০৪:৪৯	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৫	০৪:৫০	০৬:১২	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৬	০৪:৫০	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৭	০৪:৫১	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৪৩
১৮	০৪:৫২	০৬:১৪	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৪৩
১৯	০৪:৫২	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৪৩
২০	০৪:৫৩	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৪৩
২১	০৪:৫৩	০৬:১৬	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২২	০৪:৫৪	০৬:১৭	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৩	০৪:৫৪	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৪	০৪:৫৫	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৫	০৪:৫৬	০৬:১৯	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৬	০৪:৫৬	০৬:২০	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৭	০৪:৫৭	০৬:২০	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৮	০৪:৫৭	০৬:২১	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৯	০৪:৫৮	০৬:২২	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
৩০	০৪:৫৯	০৬:২২	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত